ইমাম বুখারি (রহ.) একাডেমি বাংলাদেশ'র

২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

স্মরণিকা-২০১৫

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

প্রকাশনায়

ইমাম বুখারি (রহ.) একাডেমি বাংলাদেশ

প্রকাশনায়	ঃ	**ইমাম বুখারি (রহ.) একাডেমি বাংলাদেশ** দামপাড়া, ওয়াসা, চট্টগ্রাম
সম্পাদনায়	ঃ	**হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আহমদুল হক** সভাপতি ইমাম বুখারি (রহ.) একাডেমি বাংলাদেশ
সার্বিক নিরীক্ষণে	ঃ	**মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক রিজভী** প্রভাষক ও বিভাগীয় প্রধান আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া পি-এইচ.ডি গবেষক (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
প্রকাশকাল	ঃ	১৭ রমজান ১৪৩৬ হিজরী ৫ জুলাই ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ
গ্রন্থস্বত্ব	ঃ	একাডেমি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
সার্বিক সহযোগিতায়	ঃ	কার্যকরি পরিষদ ও সকল সদস্য
ডিজাইন ও মুদ্রণে	ঃ	ইসলামিয়া কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৯৩০ ৬৮৬৪১২

সূচিপত্র

[illegible]	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	সম্পাদকীয়	০৩
০২	মাননীয় উপাচার্যের বাণী	০৪
০৩	মাননীয় জেলা প্রশাসকের বাণী	০৫
০৪	অধ্যক্ষ আল্লামা জালালউদ্দীন আলকাদেরীর বাণী	০৬
০৫	কার্যকরি পরিষদের ছবি	০৭
০৬	একাডেমির কার্যাবলি ও পরিকল্পনা	০৮
০৭	ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) ও ইল্‌ম হাদীস ড. মাওলানা মুহাম্মদ লিয়াকত আলী	০৯
০৮	ঐতিহাসিক বদর দিবস : তাত্ত্বিক পর্যালোচনা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল আযহারী	১৫
০৯	হালাল উপার্জন ও হারাম বর্জনে ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ জিয়াউল হক রেযভী	২৫
১০	ইসলামের আলোকে বিচার পদ্ধতি এড. আনিসুল ইসলাম রায়হান	৩১
১১	সংগঠনের বিগত বছরের কার্যাবলি	৩৩
১২	একাডেমির সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং	৩৬
১৩	প্রেস মিডিয়ার চোখে একাডেমির কার্যক্রম	৩৯
১৪	[illegible]	৪১

২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা-২০১৫

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহর জন্য এবং অগণিত দরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি, তার পরিবার পরিজনের প্রতি এবং প্রাণোৎসর্গী সাহাবায়ে কিরামের প্রতি। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে তার প্রতিনিধি করে এ ভূমন্ডলে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব সঠিকভাবে পালনের মধ্যে মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং সফলতা নিহিত। স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করাই সৃষ্টি জীবের চূড়ান্ত লক্ষ্য। স্রষ্টার সন্তুষ্টি পেতে সৃষ্টির সেবা করতে হবে। মানবতার সেবায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেই স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। মানবতার সেবায় আত্মোৎসর্গ করে মূর্খতা, দারিদ্রতা এবং নৈরাজ্যমুক্ত আলোকিত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে, সমাজ পরিবর্তনের প্রাণশক্তি একদল সৎ ও শিক্ষিত যুব সমাজের হাত ধরে ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মানব কল্যাণমূলক অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন "ইমাম বুখারি (রহ.) একাডেমি বাংলাদেশ"। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি এ সংগঠন সমাজে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। এলাকার গরীব দুঃখী মানুয়ের পাশে এ সংগঠন সদা তৎপর। দ্বীনের সঠিক মতার্দশ প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এ সংগঠনের উদ্যোগে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। একাডেমির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মরণিকা-২০১৫ প্রকাশিত হচ্ছে। স্মরণিকায় দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের একাধিক [illegible] ছাপানো হয়েছে। এছাড়াও একাডেমির বিগত বছরের কার্যাবলির [illegible] তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিশেষে বলতে হয়, প্রকাশনা অত্যন্ত জটিল একটি কাজ। [illegible] সত্ত্বেও মুদ্রণ জনিত ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। যদি কোনো ভুল-ত্রুটি নজরে আসে আশা করি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আল্লাহ আমাদের সংগঠনকে কবুল করুক। আমীন

বাণী

মাননীয় উপাচার্য
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মানবতার সেবায় আপনারে কর দান
সৃষ্টিজীব দিবে তোমায় অসীম সম্মান
সৃষ্টিজীবে স্রষ্টা আছে
সৃষ্টির সেবায় স্রষ্টা মিলে
মানবাত্মার সফলতা পরমাত্মার মিলনে

পরমাত্মার মিলন মানবতার সেবনে "ইমাম বুখারি (রহ.) একাডেমি বাংলাদেশ" ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ একটি আরাজনৈতিক সমাজ কল্যাণ মূলক ধর্মীয় সংগঠন। মানবতার সেবাই এ সংগঠণের প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজের প্রাণশক্তি একদল যুবসমাজ তাদের মেধা মনন এবং প্রাণের শক্তি দিয়ে মানবতার সেবার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত এই সংগঠণকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার লক্ষ্যের চূড়ায়। সত্যিকার অর্থে যুব সমাজই পারে একটি উন্নত এবং সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।

একাডেমির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে "স্মরণিকা-২০১৫" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সফলতায় হোক এই সংগঠনের নিত্যদিনের সঙ্গী। আল্লাহ তায়ালা এই সংগঠনকে মানবতার সেবায় কবুল করুক।

এ সংগঠনের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে 'স্মরণিকা-২০১৫' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ সংগঠনের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী)

২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা-২০১৫

বাণী

মাননীয় জেলা প্রশাসক
চট্টগ্রাম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অগণিত দরূদ ও সালাম। প্রিয় নবীজি ইরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে অপরের উপকার করে'। মানবতার সেবায় যারা নিয়োজিত তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এর মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানবতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর এ মহান গুণের জন্য মুসলিম-অমুসলিম সকলেই তাকে ভালবাসত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আদর্শের আলোকে তাঁর উম্মতেরা পথ চলার চেষ্টা করে অবিরত। "ইমাম বুখারি (রহ.) একাডেমি বাংলাদেশ" একটি সমাজ উন্নয়ন মূলক সংগঠন। আর্তমানবতার সেবায় এ সংগঠনটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলছে। সমাজের অন্যায়, অন্ধকার, কুসংস্কার, নির্যাতন, দুর্নীতি ও ধর্মীয় গোড়ামী দূর করাই এ সংগঠনের লক্ষ্য।

এ সংগঠনের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে 'স্মরণিকা-২০১৫' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ সংগঠনের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

(মেজবাহ উদ্দিন)

বাণী

মাননীয় বোর্ড অব গভর্নরস্

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

خير الناس من ينفع الناس (الحديث)

'সর্বোত্তম সেজন, যেজন মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করে।'

(আল-হাদিস)

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপর অগণিত দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি। প্রিয় নবীজি ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে অপরের উপকার করে"। মানবতার সেবা অতি উত্তম কাজ। মানব সেবার মাধ্যমে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। সমাজ সেবার মাধ্যমে নবীজি বিশ্ববাসীর এক অতুলনীয় উপমা রেখে গেছেন। সৎ যোগ্য এবং কর্মঠ যুব সমাজের মাধ্যমে মানব সমাজ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। "ইমাম বুখারি (রহ.) একাডেমি বাংলাদেশ" একটি সমাজ উন্নয়ন মূলক সংগঠন। এই সংগঠন গরীব দুঃখী মানুষের পাশে সদা তৎপর। সমাজকে অন্যায়, নির্যাতন, এবং দুর্নীতিমুক্ত করাই এই সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য।

একাডেমির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে 'স্মরণিকা-২০১৫' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এই সংগঠনের দীর্ঘায়ু এবং সফলতা কামনা করছি।

২৭.০৬.১৫

(আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-কাদেরী)

সম্মানিত খতিব, জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ।

কার্যকরী পরিষদ

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আহমদুল হক
সভাপতি

অধ্যাপক মুহাম্মদ কাউছার হামিদ
সিনিয়র সহ-সভাপতি

সৈয়দ মুহাম্মদ শরফুদ্দিন জঙ্গি
সাধারণ সম্পাদক

ইঞ্জিঃ মুহাম্মদ রাশেদুল মুবিন চৌধুরী
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

মুহাম্মদ খোকন
অর্থ সম্পাদক

মুহাম্মদ আজিজুর রহমান
সহ-অর্থ সম্পাদক

মুহাম্মদ শওকত হোসাইন
সাংগঠনিক সম্পাদক

মুহাম্মদ আলাউদ্দিন হোসাইন
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

এড. আনিসুল ইসলাম রায়হান
আইন বিষয়ক সম্পাদক

মুহাম্মদ জহির উদ্দিন
দপ্তর সম্পাদক

মুহাম্মদ জুবাইর সিদ্দিকী
প্রকাশনা সম্পাদক

মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন
তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক

[illegible]
প্রচার সম্পাদক

একাডেমির কার্যক্রম ও পরিকল্পনা

- প্রতি বছর ১ টি আন্তর্জাতিক মানের হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
- প্রতিটি এলাকায় সহীহ্ মতাদর্শ ভিত্তিক মক্তব পর্যায়ক্রমে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা।
- সাপ্তাহিক নামাজ ও সহীহ্ কুরআন তিলাওয়াত প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- মহিলাদের ইসলাম বিষয়ক মাসিক কর্মশালা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিভিন্ন সংকটাবস্থায় বিপদগ্রস্থদের প্রতি আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- একটি স্থায়ী বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
- আধুনিক মানের ইসলামী কিন্ডার গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করা।
- এলাকায় এলাকায় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা।
- একটি আন্তর্জাতিক মানের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
- ঈমান এবং আমল বিষয়ক গবেষণাভিত্তিক ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করা।
- ইসলামের সঠিক মতাদর্শ প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে একটি স্বতন্ত্র টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করা।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) ও 'ইল্ম হাদীস'

ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী
মুহাদ্দিস- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

জন্ম ও বংশ : ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.)'র জন্মের ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পৌত্র ইসমা'ঈল ইব্ন হাম্মাদ (ইন্তি. ২১২ হি.) বলেন, ولد جدى فى ثمانين "আমার দাদা ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।"[১] আবূ নু'আইম ফাদ্বল ইব্ন দুকাইন (ইন্তি. ২১৮ হি.) বলেন, ولد ابو حنيفة فى ثمانين وهو النعمان بن ثابت "আবূ হানীফাহ্ নু'মান ইব্ন সাবিত ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।"[২] ইবরাহীম ইব্ন 'আলী শীরাযী (ইন্তি. ৮৭৬ হি.) বলেন,

ابو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه مولى تيم الله بنى ثعلبة ولد سنة ثمانين

"ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ নু'মান ইব্ন সাবিত ইব্ন যূত্বা ইব্ন মাহ্ তাইমুল্লাহ্ সা'লাবাহ্ গোত্রের স্বাধীনকৃত গোলাম ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।" এ অভিমত সমর্থন করেছেন মুহাম্মদ ইব্ন ত্বাহির ইব্ন কায়সারানী (ইন্তি. ৫০৭ হি.) ইব্ন জাওযী (ইন্তি. ৫৭৯ হি.) 'আবদুল ক্বাদির ইব্ন আবিল ওয়াফা কুরাশী (ইন্তি. ৭৭৫ হি.) ইব্ন হাজর হায়তামী মাক্কী (ইন্তি. ৯৭৩ হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিস।[৩] হাফিয যাহাবী বলেন- ولد سنة ثمانين فى حياة صغار الصحابة "তিনি নবীন সাহাবী যুগে ৮০ হিজরীতে ভূমিষ্ঠ হন।"[৪]

দ্বিতীয় অভিমত অনুসারে তাঁর জন্ম ৭০ হিজরীতে। এ মতটি সমর্থন করেছেন ইব্ন হিব্বান (ইন্তি. ৩৫৪ হি.) আবূল ক্বাসিম সামনানী (ইন্তি. ৪৯৯ হি.) ও বাদরুদ্দীন 'আইনী (ইন্তি. ৮৫৫ হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিস।[৫] সাম'আনী (ইন্তি. ৫৬২ হি.) বলেন- ولد سنة سبعين "ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) ৭০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।"[৬]

তৃতীয় মতানুসারে তাঁর জন্ম ৬১ হিজরীতে। অনেকে এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ মত সমর্থন করেছেন মুযাহিম ইব্ন জাওয়াদ ইব্ন আবিল ওয়াফা কুরাশী (ইন্তি. ৭৭৫ হি.), বাদরুদ্দীন 'আইনী (অপর বর্ণনা মতে) প্রমুখ।[৭] ইব্ন খাল্লিকান (মৃ.৬৮১ হি.) বলেন- قيل كانت ولادة أبى حنيفة سنة إحدى وستين للهجرة "কথিত আছে, ইমাম আ'যম আবু হানীফাহ্ (রা.)'র জন্ম ৬১ হিজরীতে।"[৮] তাঁর নাম নু'মান, উপনাম আবূ হানীফাহ্ এবং উপাধি ইমাম আ'যম। বংশ তালিকা- আবূ হানীফাহ্ নু'মান ইব্ন সাবিত ইব্ন যূত্বা ইব্ন মাহ্। অনেকে তাঁর দাদার নাম যূত্বার স্থলে নু'মান বলেছেন। তিনি, তাঁর পিতা এবং দাদা প্রত্যেকে তাবি'য়ী ছিলেন। তাঁর পৌত্র 'উমার ইব্ন হাম্মাদ নিজের পরদাদা সাবিত ইব্ন যূত্বার ইসলাম সম্পর্কে বলেন- ولد ثابت على الاسلام "হযরত সাবিত ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করেছেন।"[৯]

বাল্যজীবন ও শিক্ষার্জন : ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) শৈশবকাল থেকে অত্যন্ত মেধাবী, প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় 'ইল্ম ও ইসলামী সংস্কৃতির লালনভূমি কূফা নগরে বসবাস করেন এবং জ্ঞান আহরণ, বিতরণ এবং 'ইলমী গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর দাদা ও পিতা অবস্থাসম্পন্ন ব্যবসায়ী ও খাঁটি দীনদার মুসলমান ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম, বিশেষত হযরত 'আলী

(রা.)'র সাথে এ পরিবারের গভীর সম্পর্ক ছিল। তখন কূফা নগরে তাবি'ঈন স্তরের খ্যাতিসম্পন্ন মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফক্বীহ ও ক্বারীদের অবস্থান ছিল। শৈশবকালে তিনি পবিত্র কুরআন হিফ্য করেন। তিনি কুররায়ে সাব'আর অন্যতম ইমাম 'আসিম (রা.) থেকে 'ইলমে ক্বিরাআত শিক্ষা লাভ করেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর 'ইশার অযূ দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেছেন। তিনি বহুমুখী প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ইসলামী পরিবেশ ও পরিবারে প্রতিপালিত হওয়ায় তিনি সমসাময়িক কালে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অনুরাগী ছিলেন। 'ইল্ম হাদীস ও 'ইলম কালামে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। 'আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য ও কবিতায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আজীবন ব্যবসায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি ব্যবসায় নিয়োজিত থেকেও 'ইল্ম দীনের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করে 'ইল্ম ফিক্বহে গভীর প্রজ্ঞা অর্জন করে দেশের শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ্ ও বিশ্বের ইমামে আ'যম খ্যাতি লাভ করেন।[১০]

মাশায়িখ : ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) অসংখ্য শায়খ ও উস্তাদ হতে 'ইল্ম শিক্ষা করেছিলেন। আবূ হাফ্স কাবীরের নির্দেশে তাঁর শায়খদের যে নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল তার মধ্যে চার হাজার উস্তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল। 'উক্বূদুল জুম্মান গ্রন্থে তাঁর দু'শ আশি জন উস্তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। খতীব বাগদাদী (ইন্তি. ৪৬৩ হি.) ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.)'র পনের জন মাশায়েখের নাম লিখেছেন। ইব্ন হাজর আল্ 'আসক্বালানী ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রা.)-এর মাশায়েখ ষোল জন, ইমাম যাহাবী চল্লিশ জন, জালাল উদ্দীন আস্ সুয়ূতী চুয়াত্তর জন, আল্ মিয্যী পঁচাত্তর জন, ইব্ন বাযযার একশত একানব্বই জন, মুফেক ইব্ন আহ্মাদ আল্ মাক্কী দুইশত উনচল্লিশ জন এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ সালিহী শামী শাফি'ঈ তিনশত ষাট জন মাশায়েখের নাম উল্লেখ করেছেন।[১১] তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন মাশায়েখ হলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়া'মুর বাসরী (ইন্তি. ৮৯ হি.), ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীদ নাখ'য়ী (ইন্তি. ৯৫ হি.), 'আত্বা ইব্ন ইয়াসার (ইন্তি. ১০৩ হি.), ইকরামা মাওলা ইব্ন 'আব্বাস (ইন্তি. ১০৪ হি.), মূসা ইব্ন তালহা ইব্ন 'উবাইদিল্লাহ্ তাইমী কুরাইশী মাদানী (ইন্তি. ১০৪ হি.), নাফি' মাওলা ইব্ন 'আব্বাস আবূ মা'বদ (ইন্তি. ১০৪ হি.), বাক্র ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ মুযানী (ইন্তি. ১০৬ হি.), ক্বাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবী বাক্র আস্ সিদ্দীক্ব (ইন্তি. ১০৬ হি.), মুহাম্মদ ইব্ন 'উবাইদিল্লাহ্ আবূ 'আওন সাক্বাফী (ইন্তি. ১১০ হি.), মাকহুল আবূ 'আব্দিল্লাহ্ শামী (ইন্তি. ১১৩ হি.) প্রমুখ।

ছাত্র ও শিষ্য : ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.)-এর অসংখ্য ছাত্র ছিল। 'উক্বূদুল জুম্মান গ্রন্থে তাঁর আটশ ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[১২] উল্লেখযোগ্যরা হলেন, ইমাম যুফার ইব্ন হুযায়ল আল্ আনবারী (ইন্তি. ১৫৮ হি.), 'আফিয়াহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন ক্বায়স (ইন্তি. ১৬০ হি.), আবূ সুলায়মান দাউদ ইব্ন নাসর আত্ তাঈ (ইন্তি. ১৬৫ হি.), আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্ন মিনদাল ইব্ন 'আলী (ইন্তি. ১৬৭ হি.), ইবরাহীম ইব্ন তাহমান ইব্ন শুবা (ইন্তি. ১৬৯ হি.), আবূ 'আলী হাব্বান ইব্ন 'আলী আল্ আনাযী (ইন্তি. ১৭১ হি.), আবূ 'ইসমাত নূহ ইব্ন মারইয়াম (ইন্তি. ১৭৩ হি.), আল্ ক্বাসিম ইব্ন মা'আল ইব্ন 'আবদির রহমান ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল্ হুযালী (ইন্তি. ১৭৫হি.), হাম্মাদ ইব্ন আবী হানীফাহ্ (ইন্তি. ১৭৬ হি.), ইমাম আবূ ইউসূফ ইয়া'কুব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হাবীব আল্ আনসারী (ইন্তি. ১৮২ হি.) প্রমুখ।[১৩]

রচনাবলী : ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রাহ্.)-এর সমগ্র জীবন 'ইলমি হাদীস ও 'ইলমি ফিক্হের চর্চায় অতিবাহিত করেন। তিনি যেমন নিয়মিত হাদীস ও ফিক্বহ-ফাতাওয়া শিক্ষার মজলিস পরিচালনা করেছেন তেমনি অনেক গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে কিতাবুল 'ইলম ওয়াল মুতা'আল্লিম (كتاب العلم و المتعلم), কিতাবুল ফিক্বহিল আকবার (كتاب الفقه الأكبر), আল্ মুসনাদ (المسند), কিতাবুল মাক্বসূদ (كتاب المقصود), কিতাবুল আওসাত্ব (كتاب الأوسط), ও কিতাবুল আছার (كتاب الآثار) উল্লেখযোগ্য[১৪]

ইন্তিকাল : জীবন সায়াহ্নে খলীফা আবূ জা'ফর আল্ মানসূর ইমাম আ'যমকে কাযী পদ গ্রহণ করতে বললে তিনি গ্রহণ না করায় খলীফা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বন্দী করেন। ১৫০ হিজরতে জেলখানায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইল্‌ম হাদীসে বুৎপত্তি অর্জন : ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.)-এর জন্মস্থান কূফা নগরী ছিল জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র। অসংখ্য সাহাবীর শুভাগমণে এ নগরী 'ইলম ও হিকমতে পরিপূর্ণ হয়েছিল। বিশেষত হযরত 'আলী (রা.) ও হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর 'ইলমী আলোয় আলোকদীপ্ত হয়ে কুরআন ও হাদীস চর্চায় কূফাবাসী আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এসময় অসংখ্য মহামনীষীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এ নগরীতে। ইমাম আ'যম এ 'ইলমী পরিবেশে নিজেকে হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় প্রত্যেক শহরেই সাহাবা কিরামের তত্ত্বধানে বড় বড় তাবি'ঈরা হাদীস শিক্ষা দিতেন। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে হাদীস অনুরাগীরা এ সব মজলিসে যোগ দিতেন। তিনি প্রথমে কূফা নগরের বড় বড় তাবি'ঈ হাদীসবিদ থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম শাফি'ঈ (রা.) বলেছেন, ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) কূফা নগরের ৯৩ জন তাবি'ঈ ও তাবে তাবিঈ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। ইমাম যাহাবী (রাহ্.)-এর মতে, কূফায় ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.)-এর হাদীসের উস্তাদ ছিলেন ২৯ জন। এঁদের অধিকাংশ ছিলেন বড় বড় তাবি'ঈ। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রা.) আরো হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্য বাস্‌রা গমণ করেন। এ সময়ে বাসরা নগরী হযরত হাসান বাসরী, শু'বা, কাতাদাহ, (রাহ্.) প্রমূখ বড় বড় তাবি'ঈ মুহাদ্দিসীনের 'ইল্‌মে ভরপুর ছিল। এরপর তিনি হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে হারামাইন শরীফাইন গমণ করেন। সেখানে তখন হাদীসের শিক্ষা ব্যাপকভাবে চলছিল। তাবি'ঈদের তত্ত্বাবধানে সেখানে অনেক হাদীস শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। হযরত 'আত্বা ইব্‌ন রিবাহ্ ও 'ইকরামা (রা.) প্রমূখ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মদীনা শরীফে তিনি হযরত বাকির (রা.)-এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। আবূ হাফ্‌স কাবীরের মতে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) তদানীন্তন বিশাল মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত হাদীস কেন্দ্রসমূহের প্রায় চার হাজার মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। হাফিয মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ সালিহী আশ্ শাফি'ঈ বলেন,

كان أبو حنيفة من كبار حفاظ الحديث وأعيانهم ولولا كثرة إعتنائه بالحديث ماتهيأله إستنباط مسائل الفقه.

"ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রা.) হাদীসের বড় বড় হাফিয ও উস্তাদের মধ্যে গণ্য। তিনি যদি হাদীসের প্রতি গভীর মনোযোগী না হতেন ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন না হতেন, তা হলে ফিক্বহের মাসয়ালা-মাসায়েল উদ্ভাবন করা তাঁর পক্ষে কখনোই সম্ভব হত না।"

ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন বলেন, كان أبو حنيفة تقيا نقيا زاهدا عابدا عالما صدوق اللسان أحفظ أهل زمان. "ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহ্.) অত্যন্ত মুত্তাকী, পবিত্র গুণসম্পন্ন সাধক, 'ইবাদতগুযার,'আলিম, সত্যবাদী ও সমসাময়িককালে হাদীসের সবচেয়ে বড় হাফিয ছিলেন।"

ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল্ কাত্তান বলেন, إنه والله لأعلم هذه الامة بما جاء عن الله وعن رسوله. "আল্লাহ্‌র কসম! ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) বর্তমান মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব, রাসূলের হাদীস ও সুন্নাত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি বিজ্ঞ ও জ্ঞানী।" মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইব্‌ন মু'ঈন (রাহ্.) বলতেন,

كان أبو حنيفة ثقة من أهل الدين والصدق ولم يتهم بالكذب وكان مامونا على دين الله تعالى صدوقا فى الحديث.

"ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহ্.) ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, দীনদার, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। কেউ তাঁকে মিথ্যা বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন নি। তিনি মহান আল্লাহ্‌র দীনের উপর সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং হাদীস বর্ণনায় পূর্ণ সত্যবাদী ছিলেন।" বলখের ইমাম ইব্‌ন আইয়ূব বলেন,

صار العلم من الله تعالى إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صار إلى أصحابه ثم صار إلى التابعين ثم صار إلى ابى حنيفة.

"প্রকৃত 'ইল্‌ম মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছেছে। তারপর তাঁর সাহাবারা তা লাভ করেছেন। সাহাবা থেকে পেয়েছেন তাবি'ঈরা। আর তাবি'ঈ থেকে তা কেন্দ্রীভূত ও পরিপূর্ণ হয়েছে ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্‌তে।"

হাফিয আবূ নু'আইম ইস্পাহানী ইয়াহইয়া ইব্ন নাসর হাজিব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

دخلت على أبى حنيفة فى بيت مملؤ كتبا فقلت ما هذه قال هذه أحاديث كلها وما حدثت به إلا اليسير الذى منتفع به.

"আমি ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.)-এর এক গৃহে প্রবেশ করলাম, যা কিতাবে ভর্তি ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কিতাবগুলো কিসের? তিনি বললেন, এ সবই হাদীসের কিতাব। এর সামান্য অংশ আমি বর্ণনা করেছি, যা থেকে লোকেরা উপকৃত হচ্ছে।

জালালুদ্দীন আস্ সুয়ূতী (রা.) বলেন, كان أبو حنيفة ثقة لايحدث با لحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لايحفظ. "ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি নিজের মুখস্থ ও সুরক্ষিত হাদীসই বর্ণনা করতেন। যা তাঁর মুখস্থ নেই, তা তিনি কখনো বর্ণনা করতেন না।"

'আলী ইব্ন 'আসিম বলেন- لو وزن علم أبى حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم- "তৎকালীন 'আলিমদের (হাদীসের) 'ইলমের সঙ্গে যদি ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রা.) এর 'ইলমের তুলনা করা হয় তাহলে তাঁর 'ইলম প্রাধান্য পাবে।"[১৫]

শু'বা ইব্ন হাজ্জাজ বলেন, كان والله حسن الفهم جيد الحفظ. "আল্লাহ্র শপথ, তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং উত্তম হাফিয (মুহাদ্দিস)"।[১৬] ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রা.) নিজেও হাদীস শিক্ষা ও হাসিলে সদা তৎপর ছিলেন এবং নিজের ছাত্রদেরকেও হাদীস শিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

মোট কথা, ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) তদানিন্তন বিশাল মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত হাদীস কেন্দ্রসমূহের সর্বমোট প্রায় চার সহস্র মুহাদ্দিস হতে হাদীস শিক্ষা করে গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেছেন।

হাদীস গ্রহণে শর্ত : ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) হাদীস গ্রহণে কঠোর শর্ত আরোপ করেছেন। এটি আল্লাহ্র দীনের জন্য অপরিহার্য ছিল। কেননা তাঁর যুগে বিভিন্ন প্রকারের ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্ ও এক শ্রেণির মানুষের মনগড়া রচিত মিথ্যা ও জাল হাদীসের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। এ সময় তিনি যদি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করতেন, তাহলে আল্লাহ্র দীন নির্ভুলভাবে রক্ষিত হতো না।[১৭] প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর অপরিসীম তাক্বওয়াহ্ ও দীনের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসার ফল। তিনি সাধারণ মুহাদ্দিস আরোপিত শর্তের সাথে বিশেষ শর্তারোপ করেছেন। যেমন

১. কোন হাদীস বর্ণনার পর বর্ণনাকারী যদি তা ভুলে যায়, সাধারণ মুহাদ্দিসদের কাছে তা গ্রহণীয় হলেও ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) এবং তাঁর ছাত্ররা তা গ্রহণ করেন নি।[১৮]

২. কেবল সে হাদীস গ্রহণযোগ্য, যা বর্ণনাকারী তাঁর স্মরণ ও স্মৃতির ভিত্তিতে বর্ণনা করেন।[১৯]

৩. যেসব প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের মজলিসে বিপুল সংখ্যক শ্রবণকারীর সমাবেশ হওয়ায় উচ্চ শব্দকারী লোক নিয়োগ করা হয় এবং তাদের নিকট শ্রুত হাদীসকে আসল মুহাদ্দিসের নিকট শ্রুত হাদীস বলে বর্ণনা করা হয়, ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.)-এর নিকট সে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। হাফিয আবূ না'ঈম, ফাদ্বল ইব্ন দুকাইন, ইব্ন কুদামাহ্ প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসও এ মত পোষণ করেন। হাফিয ইব্ন হাজার মাক্কীর মতে এটা বিবেকসম্মত কথা হলেও সাধারণ মুহাদ্দিসের মতই সহজবোধ্য।[২০]

৪. যে বর্ণনাকারী নিজের খাতায় লিখিত পেয়ে কোন হাদীস বর্ণনা করেন, কিন্তু তা তাঁর কোন উস্তাদ হতে শুনেছেন বলে মনে পড়ে না, ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ (রা.) এ ধরণের হাদীস সমর্থন করেন নি। অপরাপর মুহাদ্দিসের মতে এতে কোন দোষ নেই।[২১]

কূফাবাসী মুহাদ্দিসীন হাদীসের মূল বক্তব্য নিজ ভাষায় বর্ণনা (روايةبالمعنى) করা জায়েয মনে করেন। তখন তা সাধারণভাবে হাদীস গ্রহণ রীতি হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসের মূল শব্দ বর্ণনাকারীর সংখ্যা বেশি ছিল না। ফলে হাদীস বর্ণনায় পার্থক্য ও রদ্-বদল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি হাদীস গ্রহণে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। এসব সতর্কতার পর তিনি যে হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেছেন তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনায় সতর্কতা : ইমাম আবূ হানীফাহ্ অত্যন্ত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে হাদীস গ্রহণ করতেন। মুআফফিক আল্ মাক্কীর মতে, তিনি চল্লিশ সহস্র হাদীস হতে যাচাই-বাছাই করে কিতাবুল আসারের (মুসনাদ) জন্য হাদীস নির্বাচন করেন।[২২] অধিক সতর্কতা ও কঠোর শর্তারোপের মাধ্যমে তিনি হাদীস গ্রহণ করতেন। ফলে তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা অপরাপর মুহাদ্দিসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন- عندى صناديق من الحديث ما أخرجت منها الا اليسير الذى ينتفع به. "আমার নিকট কয়েক সিন্দুক পরিমাণ হাদীস ছিল, আমি তা থেকে অল্প পরিমাণ হাদীস গ্রহণ করেছি, যা ব্যবহারিক জীবনে উপকার দিবে।"[২৩] হাদীস চয়ন ও হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর এ অসামান্য সর্তকতা সম্পর্কে ইমাম ওয়াকী' বলেন,

لقد وجد الورع عمن ابى حنيفة فى الحديث ما لم يوجد عن غيره.

"হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহ্.) যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, তদ্রুপ আর কারো দ্বারা অবলম্বিত হয়নি।"[২৪] একারণেই সম্ভবতঃ মুহাদ্দিসীন ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রা.) এর সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁকে مشدد فى الرواية অর্থাৎ হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত কঠোর ও কড়া লোক বলে অভিহিত করেন এবং এ কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অধিক নয়।" ইমাম নাসাঈ (রাহ্.) ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রা.) সম্পর্কে মন্তব্য করেন, ليس بالقوى فى الحديث "তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন।" মুহাদ্দিসরা এর উত্তরে বলেছেন, 'আলিমরা আল্ জারহু ওয়াত তা'দীল (الجرح والتعديل) এর কতিপয় মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন এবং এর ভিত্তিতে একজন বর্ণনাকারীকে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এর প্রথম নীতি হল, যে ব্যক্তির ইমামত ও 'আদালত (ন্যায় পরায়নতা) সার্বজনীন (متواتر) পর্যায় অতিক্রম করেছে। তার দু'একটি ত্রুটি ধর্তব্য হবে না। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (র.)-এর ইমামত ও 'আদালতও متواتر (মুতাওয়াতির) পর্যায়ে পৌছার কারণে তাঁর ছোট খাটো ত্রুটি বিবেচ্য হবে না।[২৫] অনুরূপভাবে আরো কতিপয় 'আলিম ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রা.) কে দুর্বল রাভী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশেষণ করলে তাদের দাবী অসার প্রমাণিত হয়। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রা.)-এর বিরুদ্ধে কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অথচ তাঁর কিতাবুল আসার (আল্ মুসনাদ) গ্রন্থে অনেক হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রা.) স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করলেও বিপুল সংখ্যক হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল বলে 'আলিম সমাজ সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি মানুষের নিকট বর্ণনার জন্য হাদীস মুখস্থ করেননি বরং তিনি 'আমল ও ফিক্বহী মাসয়ালা উদ্ভাবনের জন্য হাদীস মুখস্থ করতেন।[২৬]

ইমাম আবুল মুয়াইয়্যাদ মুহাম্মদ ইব্ন মাহমুদ আল্ খাওয়ারিযমী (ইন্তি. ৬৬৫ হি.) মুহাদ্দিসীনের সংগ্রহকৃত ইমাম আ'যমের পনের খানা মুসনাদকে জামি'উল মাসানীদ নামে একত্রে সংকলন করেন।[২৭] আল্ খাওয়ারিযমী তাঁর সংকলিত জামি'উল মাসানীদ এর ভূমিকায় গ্রন্থটি সংকলনের কারণ সম্পর্কে লিখেছেন, আমি সিরিয়ার কতিপয় অজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখলাম, তারা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রা.)-এর মান-মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত। তাদের বক্তব্য ছিল, তিনি বেশী হাদীস জানতেন না। তিনি 'ইলমুল হাদীসের কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন নি। মাত্র কয়েকটি হাদীস তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, অন্যান্য ইমাম যেমন ইমাম শাফি'ঈ (রা.)-এর মুসনাদ রয়েছে। ইমাম মালিক (রা.)-এর মুয়াত্তা রয়েছে। একথা শ্রবন করে আমার মনে দীনী অনুভূতি ও উদ্দীপনা জাগ্রত হল এবং আমি দৃঢ় ইচ্ছা করলাম, তাঁর পনেরটি মুসনাদ যা প্রখ্যাত হাদীসবিদরা সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন, সে সব একত্রে সংকলন করব।[২৮] হাদীস অনুধাবনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রা.)-কে বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন। তিনি এ বিষয়ে পারদর্শিতা ও বুৎপত্তি অর্জন করেছেন।

এ থেকে বুঝা যায়, হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনায় ইমামুল হাদীস হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফাহ্ নু'মান ইব্ন সাবিত (রা.) সর্বদা সতর্ক ছিলেন।

তথ্যসূত্রঃ

১. আবূ বাক্‌র আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী খাতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, খণ্ড ১৩ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ) পৃ. ৩২৬।

২. শামসুদ্দীন আয্‌ যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড ৬ (বৈরূতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ্‌, ১৪১৩ হি.) পৃ. ৩৯৫।

৩. আবূ ইসহাক্ব শীরাযী, তাবাক্বাতুল ফুক্বাহা, খণ্ড ১, পৃ. ৮৭; ইব্‌ন জাওযী, আল্‌ মুনতাযিম ফী তারীখিল মুলূকী ওয়াল উমাম, খণ্ড ৮, পৃ. ১২৯; কুরাশী, আল্‌ জাওয়াহিরুল মুদ্বিয়্যাহ ফী ত্বাবক্বাতিল হানাফিয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃ. ২৭; ইব্‌ন হাজার আল্‌ হায়সামী, আল্‌ খায়রাতুল হিসান, পৃ. ৩১।

৪. শামসুদ্দীন আয্‌ যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১।

৫. শামসুদ্দীন আয্‌ যাহাবী, মানাক্বিবুল ইমাম আবী হানীফাহ্‌, (মিসরঃ দারুল কিতাব আল 'আরাবী, তা.বি) পৃ. ৭; বাদরুদ্দীন 'আইনী, 'উমদাতুল ক্বারী শারহু সাহীহিল বুখারী, (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি.) পৃ. ৯৫।

৬. সামা'আনী, আল্‌ আনসাব, খণ্ড ২ (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি.) পৃ. ৩৫৬।

৭. খাতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, খণ্ড ১৩ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ) পৃ. ৩৩১; কিরদারী, মানাক্বিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফাহ্‌, খণ্ড ১ (পাকিস্তানঃ মাকতাবা আল্‌ ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৭ হি.) পৃ. ৫; কুরাশী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ২৭; 'আইনী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৯, পৃ. ৯৫।

৮. ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, খণ্ড ৫ (বৈরূতঃ দারুস্‌ সাক্বাফ, ১৯৬৮ খ্রি.) পৃ. ৪১৩।

৯. খাতীব বাগদাদী, প্রাগুক্ত; নববী, তাহ্‌যীবুল আসামা ওয়াল্‌ লুগাত, খণ্ড ২ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.) পৃ. ৫০১।

১০. মুহাম্মদ আবূ যাহ্‌রা আল্‌ মিসরী, আবূ হানীফা হায়াতুহু ওয়া আছরুহু আরাউহু ওয়া ফিক্‌হুহু, (কায়রো : দারুল ফিকর আল্‌ 'আরবি ১৯৯৭ খ্রি.) পৃ. ১৯-২৪; ইব্‌ন হাজার আল্‌ হায়সামী, আল্‌ খায়রাতুল হিসান ফী মানাক্বিবিল ইমাম আবী হানীফাহ্‌ আন্‌ ন'মান, (পাকিস্তানঃ এস.এম.সা'ঈদ কোম্পানী, ১৪১৪হি.) পৃ. ৬৫; ড.মুস্তাফা আস্‌ সুবা'য়ী, আস্‌ সুন্নাহ্‌ ওয়া মানযিলাতুহা ফিত্‌ তাশরী'য়িল ইসলামী (দিওবন্দঃ ইত্তিহাদ বুক ডিপো, তা.বি.) পৃ. ৪৩; এ.এম.এম, সিরাজুল ইসলাম, ইমাম আযম আবূ হানীফাহ্‌ (র.), সং ৩, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.) পৃ. ২৯; ড. হামযাহ্‌ আন্‌ নুসরাতি, শায়খ মুস্তাফা 'আবদুল হাফিয, ও ড.'আবদুল হামীদ, আল্‌ ইমাম আবূ হানীফাহ্‌ আন্‌ নূ'মান, (কায়রোঃ আল্‌ মাকতাবাতুল ক্বায়্যিমাহ, তা.বি.) পৃ. ২৬

১১. ড.মুস্তাফা সুবা'য়ী, প্রাগুক্ত; ড.হামযা আন্‌ নূসরাতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; খাতীব বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১৩, পৃ. ৩২৫; 'আসক্বালানী, তাহযীবুত্‌ তাহযীব, খণ্ড ১০, পৃ. ৪০১; যাহাবী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬, পৃ. ৫৩০; সুয়ূতী, তাব্‌য়ীদুস সাহীফাহ্‌ ফী মানাক্বিবি আবী হানীফাহ্‌, পৃ. ৩৯-৬৫; মিয্‌যী, তাহ্‌যীবুল কামাল, খণ্ড ২৯, পৃ. ৪১৮-৪২০; কিরদারী, মানাক্বিবুল ইমামিল আ'যম আবী হানীফাহ্‌, খণ্ড ১, (পাকিস্তানঃ মাকতাবা ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৭ হি.) পৃ. ৭০-৮৮; 'উকুদুল জুম্মান ফী মানাক্বিবি আবী হানীফাহ্‌ আন্‌ নূ'মান, (করাচীঃ মাকতাবাতুশ শায়খ, তা.বি) পৃ. ৬৩-৮৭।

১২. এ.এম.এম, সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

১৩. ড.হামযা আন্‌ নুসরাতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০; ইব্‌ন খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'ইয়ান, প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ. ২১৫; খাতীব বাগদাদী, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১৩, পৃ. ৩৩৭; ইব্‌ন সা'দ, আত্‌ তাবাক্বাতুল কুবরা, খণ্ড ৭, পৃ. ৩৫৭; হামাভী, সামারাতুল আওরাক্ব, খণ্ড ১, পৃ. ২৪০।

১৪. হাজী খালীফাহ্‌, কাশফুয্‌ যুনূন, খণ্ড ২, পৃ. ১৪৩৭।

১৫. মানকাবাতুল ইমাম আবী হানীফাহ্‌, পৃ. ১৯৬।

১৬. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ১০, পৃ. ৭৭।

১৭. মুহাম্মাদ আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।

১৮. মুক্বাদ্দামাতু ইবনিস্‌ সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. ফাতুহুল মুগীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

২১. মুক্বাদ্দামাতু ইবনিস্‌ সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

২২. আল মানাকিবু লিল মুআফফিক, খণ্ড ১, পৃ. ৯৫।

২৩. প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ৯৫-৯৬।

২৪. প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৯৭।

২৫. দারেমি তিরমিযী, খণ্ড ১, পৃ. ৯৬।

২৬. প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১০৮, ১০৯।

২৭. কাশফুয যুনুন, খণ্ড ২ পৃ. ১৬৮০,১৬৮১; মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফাহ বায়নাল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ২৭৪; সীরাতে নু'মান, পৃ. ৬৮; আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃ. ৪১৪।

২৮. জামি'উল মাসানীদ, ১ম খ. পৃ. ৪-৫।

ঐতিহাসিক বদর দিবস: তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল আযহারী
শিক্ষক- ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সেনাপতিত্বে এমন এক সময় এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়, যখন মুসলমানের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। যা মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে দ্বিতীয় হিজরীতে সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমরা সংখ্যায় অনেক কম হয়েও মক্কার কাফির শক্তিকে পরাজিত করে ইসলামের স্বর্নোজ্জল সূচনার সৃষ্টি করেন। এর মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়। এজন্য এই যুদ্ধকে "সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী" বলা হয়। আল-কুরআনে এই দিনকে "ইয়াওমূল ফুরক্বান" বলা হয়। এই যুদ্ধে জয়ের পরে আরব উপদ্বীপে মুসলিমদের ভিত্তিমূল সুপ্রোথিত হয়; ইসলাম একটা সুন্দর রাষ্ট্রীক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়।

মুসলমানদের গৌরবময় উজ্জ্বল ইতিহাসের স্বর্ণখচিত দিন ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ। ইসলামের ইতিহাসে 'বদর' এক অবিস্মরণীয় ঘটনা, কুদরতী শক্তির এক বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ। বদরের যুদ্ধ সত্য প্রমাণ করেছে কোরআনের সে ঘোষণাকে যাতে বলা হয়েছে- كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مع الصابرين (البقرة ٢٤٩) অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলও বৃহত্তর শক্তির ওপর বিজয়ী হয়েছে (বাক্বরা-২৪৯) আর তা সম্ভব হয়েছে স্রষ্টার কুদরতী শক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্যের ফলেই। আল্লাহই বিজয় দানকারী, তাঁর ওপর ভরসা করেই এগিয়ে যেতে হবে মুসলমানদের।

উল্লেখ্য, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনার পথে মক্কা ত্যাগের দিন থেকে একটি নতুন সাল হিজরির সূচনা। তাঁর এই দেশ ত্যাগকেই বলা হয় হিজরত। মুসলমানদের ইতিহাসে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচিত। মদিনার মানুষ প্রাণঢালা উষ্ণ সংবর্ধনা দেওয়ার ভিতর দিয়ে আল্লাহর নবীকে গ্রহণ করলেন। এর পরই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে একটি নগর-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তৎপরতা শুরু করলেন। মক্কী হিজরতকারী, মদিনার আনসার, ইহুদি এবং আরবদের মধ্যে যারা তখনও ইসলাম কবুল করেনি তারা সহ সকল মদিনাবাসীকে পরামর্শের জন্য ডাকা হলো এবং তাদের সম্মুখে একটি শাসনতন্ত্র পেশ করা হলো। দুনিয়ার ইতিহাসে এটিই হচ্ছে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র। এতে শাসক ও শাসিত উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছিল। হিজরির দ্বিতীয় বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বেচ্ছামূলক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ দুটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, সমাজকে সংগঠিত করাই ছিল মদিনাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাথমিক কাজগুলোর অন্যতম। মুসলমানেরা এমনি করে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন শুরু করলেন, হলেন সতর্ক।

বদর ইসলাম ও মুসলমানের জয়ের ইতিহাস। বদর হলো অধিক সংখ্যকের ওপর স্বল্পসংখ্যক মুমিনের সফলকাম হওয়ার ইতিহাস। বদর হলো আত্মত্যাগের ইতিহাস। বদর হলো শাহাদাতের সূচনার ইতিহাস। বদর হলো ইসলাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জাহলের করুণ মৃত্যুর লজ্জাকর ইতিহাস। বদর হলো যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতা দিয়ে মুমিনদেরকে আল্লাহর সাহায্য করার ইতিহাস। আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেন: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار (آل عمران-١٣) 'নিশ্চয়ই পরস্পর সম্মুখীন বাহিনীদ্বয়ের মধ্যে তোমাদের জন্য সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। একটি বাহিনী আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছিল, অপর বাহিনীটি ছিল খোদাদ্রোহী।' (আলে ইমরান-১৩)

বদর পরিচিতি: ইসলামের ইতিহাসে বদর একটি অন্যতম বিজয় প্রান্তর। বদর পবিত্র মদীনা শরীফ হতে প্রায় ৮০ মাইল দূরবর্তী একটি কূপের নাম। এ নামে একটি গ্রামও রয়েছে। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ সংগঠিত হয় হিজরী ২য় সনের ১৭ রমজান মোতাবেক ৬২৪ সনের ১৮ নভেম্বর শুক্রবার। মতান্তরে ৬২৪ সনের ১৭ মার্চ। ইসলামের ইতিহাসে এটি-ই সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। সংক্ষিপ্তাকারে বদর যুদ্ধের ইতিহাস, গুরুত্ব,তাৎপর্য ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

বদর যুদ্ধের কারণ ও পটভূমি: মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে কুরাইশরা তাদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায়। তাদেরকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত ও তাদের ধন-সম্পদ জবর দখল করে নেয়া হয়। অন্যদিকে যে সব দেশে মুসলমানগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন কুরাইশরা সে সব দেশের শাসক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের উপর রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যার্থতায় পর্যবসিত হয়। (তারীখে তাবারী-১/১৬০৩, ইবনে হিশাম ২১৭ পৃঃ)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে চলে এলেন। তারপর মদীনায় নতুন একটি নগররাষ্ট্র, নতুন সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্বকীয়তা ও দ্বীন ইসলামের মূল কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছিলেন। এটা দেখে মক্কার কুরাইশরা ঈর্ষান্বিত হলো। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তারা নানা ষড়যন্ত্রের পথ খুঁজতে লাগল। মক্কার কুরাইশগণ চিন্তা করল যে, আমরা তো সবাই মিলে মক্কায় তাঁকে (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম.) দমন করে রাখতে পেরেছিলাম, কিন্তু এখন মদীনায় গিয়ে তিনি নতুন রূপে বাধাহীনভাবে ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন। যদি এরূপ প্রচার অব্যাহতভাবে চলতে থাকে আর তার এই সংগ্রাম সামনে অগ্রসর হতে থাকে তাহলে অচিরেই মদীনার মুসলিমগণ মক্কার লোকজনের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। অতএব তাদের অঙ্কুরেই বিনাশ করা প্রয়োজন।

অপর দিকে, মাত্র জন্ম নেয়া মদীনা নামক নগররাষ্ট্র তথা ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি ক্রমবর্ধমান হচ্ছিল, যেটি সেখানে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথীরা চিন্তা করলেন যে, আমরা মক্কা থেকে বের হয়ে এসেছি সত্য, কিন্তু মক্কার হুমকি থেকে আমরা এখনো মুক্ত হতে পারিনি। আমরা এখনো তেমন শক্তি অর্জন করতে পারিনি। তাই আগে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন এবং আল্লাহর দ্বীনকে তার জমিনে প্রতিষ্ঠা করতে হলে যুদ্ধের কোনো বিকল্প নেই। মোটামুটি এ ধরনের চিন্তাভাবনার প্রেক্ষাপটের পরেই মক্কা ও মদিনা এই দুই শহরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠির মধ্যে একটি যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার।

বদর যুদ্ধের পরোক্ষ কারণ : ২য় হিজরী সনের ১৭ই রামাযান (৬২৪ খৃঃ ১১ই মার্চ শুক্রবার ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যা ছিল মদীনায় হিজরতের মাত্র ১ বছর ৬ মাস ২৭ দিন পরের ঘটনা। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কুরায়েশরা রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মদীনা থেকে বের করে দেবার জন্য নানাবিধ অপচেষ্টা চালায়। যেমনভাবে তারা ইতিপূর্বে হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানদের সেখান থেকে বের করে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু সেখানে তারা ব্যর্থ হয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি কারণে। এক- সেখানে ছিল একজন ধর্মপরায়ণ খৃষ্টান বাদশাহ নাজ্জাশীর রাজত্ব। যিনি নিজে রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দুই- মক্কা ও হাবশার মধ্যখানে ছিল আরব সাগরের একটি প্রশস্ত শাখা। যা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে হামলা করা সম্ভব ছিল না। তিন-হাবশার লোকেরা ছিল হিব্রুভাষী। তাদের সাথে কুরায়েশদের কোনরূপ আত্মীয়তা কিংবা পূর্ব পরিচয় ছিল না। ধর্ম, ভাষা ও অঞ্চলগত মিলও ছিল না।

পক্ষান্তরে ইয়াছরিব ছিল কুরায়েশদের খুবই পরিচিত এলাকা। যার উপর দিয়ে তারা নিয়মিতভাবে সিরিয়াতে ব্যবসার জন্য যাতায়াত করত। তাছাড়া তাদের সঙ্গে ভাষাগত মিল এবং আত্মীয়তাও ছিল। অধিকন্তু রাস্তা ছিল স্থলপথ, যেখানে নদী-নালার কোন বাধা নেই। দূরত্ব প্রায় ৫০০ কিলোমিটারের কাছাকাছি হ'লেও সেখানে যাতায়াতে তারা অভ্যস্ত ছিল।

নিম্নে আমরা বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরোক্ষ কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

১. মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের নিকটে কুরায়েশ নেতাদের পত্র প্রেরণ। উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। রাসূলের আগমনের কারণে তার ইয়াছরিবের নেতৃত্ব লাভের মোক্ষম সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় সে ছিল দারুণভাবে ক্ষুব্ধ। রাসূলের প্রতি তার এই ক্ষোভটাকেই কুরায়েশরা কাজে লাগায় এবং নিম্নোক্ত কঠোর ভাষায় হুমকি দিয়ে তার নিকটে চিঠি পাঠায়।

انكم اويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله تقاتله أو لتجرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساء كم-

'তোমরা আমাদের লোকটিকে (মুহাম্মাদকে) আশ্রয় দিয়েছ। এজন্য আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, হয় তোমরা অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ও তাকে বের করে দিবে অথবা আমরা তোমাদের উপরে সর্বশক্তি নিয়ে হামলা করব এবং তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করব ও মহিলাদের হালাল করে নেব'।

এই পত্র পেয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দ্রুত তার সমমনাদের সাথে গোপনে বৈঠকে বসে গেল। কিন্তু সংবাদ রাসূলের নিকটে পৌঁছে গেল। তিনি সরাসরি তাদের বৈঠকে এসে হাযির হ'লেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি দেখছি কুরায়েশদের হুমকিকে তোমরা দারুণভাবে গ্রহণ করেছ। অথচ এর মাধ্যমে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে যে পরিমাণ ক্ষতির মুখে ঠেলে দিতে যাচ্ছ, কুরায়েশরা তোমাদের সেই পরিমাণ ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। أتريدون أن تقاتلوا أبناء كم وإخو انكم 'তোমরা কি তোমাদের সন্তান ও ভাইদের সাথে (অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে) যুদ্ধ করতে চাও'? রাসূলের মুখে এ বক্তব্য শুনে বৈঠক ভেঙ্গে গেল ও দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল (আবুদাঊদ, হা/৩০০৪, 'খারাজ' অধ্যায়।)

যদিও আব্দুল্লাহর অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলতে থাকল। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিক ও ইহুদীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে থাকেন। যাতে হিংসার আগুন জ্বলে না ওঠে।

২. আওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) ওমরাহ করার জন্য মক্কায় যান ও কুরায়েশ নেতা উমাইয়া বিন খালাফের অতিথি হন। উমাইয়ার ব্যবস্থাপনায় দুপুরে নিরিবিলি ত্বাওয়াফ করতে দেখে আবু জাহল তাকে ধমকের সুরে বলে, ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة؟ 'আমি তোমাকে দেখছি মক্কায় বড় নিরাপদে ত্বাওয়াফ করছ। অথচ তোমরা বেদ্বীনগুলোকে আশ্রয় দিয়েছ! ..... আল্লাহর কসম! যদি তুমি আবু ছাফওয়ানের (উমাইয়া বিন খালাফের) সাথে না থাকতে, তবে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না'। একথা শুনে সা'দ চীৎকার দিয়ে বলে ওঠেন, তুমি আমাকে এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমি তোমার জন্য এর চেয়ে কঠিন বাধা হয়ে দাড়াবো- আর সেটা হ'ল মদীনা হয়ে তোমাদের ব্যবসায়ের রাস্তা বন্ধ হবে'। (বুখারী, হা/৩৯৫০ 'মাগাযী' অধ্যায়, ২ পরিচ্ছেদ।)

৩. কুরায়েশ নেতারা ইহুদীদের সাথে গোপনে আঁতাত করলো। অতঃপর মুহাজিরগণের নিকটে হুমকি পাঠালো এই মর্মে যে, 'মক্কা থেকে তোমরা নিরাপদে ইয়াছরিবে পালিয়ে যেতে পেরেছ বলে অহংকারে ফেটে পড়ো না। ওখানে গিয়েই আমরা তোমাদের ধ্বংস করে দেবার ক্ষমতা রাখি'। তাদের এই হুমকি কেবল ফাঁকা বুলি ছিল না। বরং তারা হর-হামেশা তৎপর ছিল মুহাজিরগণের সর্বনাশ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতেন না। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১০৫, তিরমিযী হা/৩৩২০ 'তাফসীর' অধ্যায়।)

কুরায়েশদের অপতৎপরতা কেবল রাসূলের বিরুদ্ধেই ছিল না; বরং প্রত্যেক মুহাজির মুসলমানের বিরুদ্ধে ছিল। যেজন্য তারা সর্বদা ভয়ের মধ্যে থাকতেন এবং রাতের বেলা অস্ত্র নিয়ে ঘুমাতেন। যেমনটি হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে। এ সময় ভীত-শংকিত ছাহাবীগণ রাসূলকে বলতে থাকেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি চিরকাল এভাবে ভয় ও ত্রাসের মধ্যে কাটাবো? জবাবে আয়াত নাযিল হয়- أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.

'তোমরা কি ভেবেছ জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের উপরে এখনো সেইসব লোকদের মত অবস্থা

আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছেন। যাদের উপরে এসেছিল নানাবিধ কষ্ট ও বিপদাপদ। আর সেই ভূমিকম্প সদৃশ বিপদে গ্রেফতার হয়ে তৎকালীন রাসূল ও তাঁর ঈমানদার সাথীগণ বলে উঠেছিলেন, متى نصر الله 'কখন আল্লাহর সাহায্য পাব'। (তখনই সান্ত্বনা দিয়ে নাযিল হয়েছিল) الا إن نصر الله قريب শোনো! আল্লাহর সাহায্য অতীব নিকটবর্তী' (বাক্বারাহ ২/২১৪)। হাঁ আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী হ'ল। তবে তা অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে নয় বরং মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে। তাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হ'ল, যার পিছনে আল্লাহর সাহায্য ক্রিয়াশীল ছিল।

যুদ্ধের অনুমতি : কুরায়েশদের সন্ত্রাসমূলক অপতৎপরতা ও প্রকাশ্যে হামলা সমূহ মুকাবিলার জন্য আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে এ সময় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন, اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير 'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল ঐ লোকদের। যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, একারণে যে, তারা অত্যাচারিত হয়েছে। আর তাদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমতাবান' (হজ্জ ২২/৩৯)। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, এটাই প্রথম আয়াত, যা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে নাযিল হয়। (নাসাঈ, হা/৩০৮৫ 'জিহাদ' অধ্যায়, ১ অনুচ্ছেদ)

এই যুদ্ধ বা সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি দানের কারণ ছিল তিনটি : ১. মুসলমানেরা ছিল মযলূম এবং হামলাকারীরা ছিল যালেম। ২. মুহাজিরগণ ছিলেন নিজেদের জন্মস্থান ও বাসগৃহ হ'তে বিতাড়িত তাদের মাল-সম্পদ ছিল লুণ্ঠিত। তারা ছিলেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত। স্রেফ বিশ্বাসগত পার্থক্যের কারণে। দুনিয়াবী কোন স্বার্থের কারণে নয় (হজ্জ ৪০)। ৩. মদীনা ও আশপাশের গোত্রসমূহের সাথে রাসূলের সন্ধিচুক্তি ছিল। যাতে পরস্পরের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছিল। এক্ষণে পূর্বেও ধারণা ও রীতি-নীতি পরিবর্তন করে মুসলমান হওয়ার কারণে অথবা মুসলমানদের সহযোগী হওয়ার কারণে যদি তাদের উপরে হামলা হয়, তাহ'লে চুক্তি ও সন্ধি রক্ষার স্বার্থে তাদের জান-মালের হেফাযতের জন্য রাসূলকে যালেমদের হামলা প্রতিরোধে এগিয়ে যাওয়াটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল। ফলে অসহায় মুসলমানদের বাধ্যগত অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাদেরকে সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন। মুবারকপুরী বলেন, সঠিক কথা এই যে, জিহাদের এই অনুমতি হিজরতের পরে মদীনাতেই নাযিল হয়েছিল। এরপর ১ম হিজরীর রামাযান মাস থেকে কুরায়েশদের হামলা প্রতিরোধে মদীনার বাইরে নিয়মিত সশস্ত্র টহল অভিযান সমূহ প্রেরিত হয়ে থাকে। যা একবছর অব্যাহত থাকে। অতঃপর ২য় হিজরীর শা'বানে নাখলা যুদ্ধের পর বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে জিহাদ ফরয হয় এবং উক্ত মর্মে সূরা বাক্বারার ২/১৯০-১৯৩ এবং সূরা মুহাম্মাদ ৪৭/৪-৭ ও ২০ আয়াত সমূহ নাযিল হয়।

বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরিয়া ফেরত মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও তাদের পুরা খবরাখবর সংগ্রহের জন্য তালহা বিন উবায়দুল্লাহ ও সাঈদ বিন যায়েদকে প্রেরণ করেন। তারা 'হাওরা' (الحوراء) নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারেন যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বিরাট এক ব্যবসায়ী কাফেলা সত্বর ঐ স্থান অতিক্রম করবে: যাতে রয়েছে এক হাজার উট বোঝাই কমপক্ষে ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রার মাল-সম্পদ এবং তাদের প্রহরায় রয়েছে আমর ইবনুল আছ সহ মাত্র ৪০ জন সশস্ত্র জোয়ান। উল্লেখ্য যে, এই বাণিজ্যে মক্কার সকল নারী-পুরুষ অংশীদার ছিল। ইবনে আকবার বর্ণনাতে, মক্কার এমন কোন কোরায়েশ নারী বা পুরুষ ছিল না যার অংশ এ বাণিজ্যে ছিল না। কারো কাছে এক মিসকাল পরিমাণ সোনা থাকলে, সেও তার এ বাণিজ্যের অংশ হিসেবে লাগিয়েছে। এ কাফেলার মোট পুঁজি সম্পর্কে ইবনে আকাব বলেন, তা ছিল ৫০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা (দিনার)। ১৪০০ বছর পূর্বে যার মূল্য ছিল ২৪ লাখ টাকা। যা বর্তমান বাজারে প্রায় ১৫০ কোটির অপেক্ষাও বেশি। প্রকৃতপক্ষে এ বাণিজ্য কাফেলাটি ছিল কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কোম্পানী। তারা দ্রুত মদীনায় ফিরে এসে রাসূলকে এই খবর দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন যে, এই বিপুল মাল-সম্পদ মক্কায় পৌঁছে গেলে তার প্রায় সবই ব্যবহার করা হবে মদীনায় মুহাজিরগণকে ধ্বংস করার কাজে। অতএব আর মোটেই কালক্ষেপন না করে তখনই বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন ওই কাফেলাকে আটকানোর জন্য।

অপরপক্ষে মুসলমানরাও হিযরতের পর মদীনা থেকে প্রতিশোধ গ্রহনের ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত হতে থাকে। তারা কুরাইশদের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেন। কুরাইশদের সমস্ত গৌরব, অহংকার ও শক্তির প্রধান উৎস ছিল শাম দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য। তাই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে তাদের গর্ব ও অহংকারকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা তাদের উপর ঝটিকা আক্রমণ চালায় এবং ব্যবসার সুযোগ বন্ধ করে দেয়।

ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন,একথা সকলের জানা ছিল যে, কুরাইশদের এ বাণিজ্য এবং এ বাণিজ্যিক পুঁজিই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি। এর উপর ভরসা করে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের উপর উৎপীড়ন করে মক্কা থেকে মদীনায় যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিরিয়া থেকে এ কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন তখন তিনি স্থির করেন যে,এখনই কাফেলার মোকাবেলা করার। কুরাইশদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করে নির্দেশ দিলেন যে, যাদের নিকট এ মুহূর্তে সাওয়ারী উপস্থিত রয়েছে এবং জেহাদের যেতে চান শুধু তারাই যাবে। আরও যারা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাদের সাওয়ারী ছিল গ্রাম এলাকায়,তারা গ্রাম থেকে সাওয়ারী এনে পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন। কিন্তু তখন এতটা অপেক্ষা করার সময় ছিলনা। কাজেই নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে অগ্রহীদের মধ্য হতে খুব কম সংখ্যককে তিনি সাথে নিতে পারলেন। তাদেরকে নিয়েই তিনি রওয়ানা হলেন যুদ্ধ যাত্রায়। বি'রে সুকাইয়া নামক স্থানে পৌছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়েস ইবনে সাদাআ (রাঃ)-কে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন। তখন তিনি গণনা করে জানালেন যে, সৈন্য সংখ্যা ৩১৩ জন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, তালুতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল। কাজেই লক্ষণ ভালো। বিজয় ও সফলতার লক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কেরামদের সাথে মোট উট ছিল ৭০টি। প্রতি ৩ জনের জন্য ১টি। যাতে তারা পালাক্রমে সাওয়ার করেছিলেন। এমনকি স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেরও পালাক্রমে পালা এলে পায়ে হেটে যেতেন। অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান 'আইনে যোরকায়' পৌছে একব্যক্তি কুরাইশ কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানকে এ সংবাদ দিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কাফেলার অপেক্ষা করছেন। তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবু সুফিয়ান সতর্কতা মূলকঃ প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। যখন হেজাজের সিমানায় কাফেলাটি পৌছল, তখন জনৈক দমদম ইবনে ওমরকে কুঁড়ি মিসকাল স্বর্ণ অর্থাৎ তখনকার প্রায় ২ হাজার টাকা মজুরি দিয়ে এ ব্যাপারে রাজী করাল যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রিতে চড়ে যথাশীঘ্র মক্কায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌছে দিবে যে, তাদের কাফেলা সাহাবায়ে কেরামের আক্রমণে আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েছে। দমদম ইবনে ওমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশঙ্কার ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক-কান কেটে এবং নিজের পরীধেয় বস্ত্রের সামনে পেছনে ছিড়ে ফেলল এবং হাওলদাটি উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিল। এটি ছিল সেকালে ঘোর বিপদের চিহ্ন। যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকলো, গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈ-চৈ পড়ে গেল। সাজ সাজ রব উঠলো। সমস্ত কুরাইশ প্রতিশোধের জন্য তৈরি হয়ে গেল। মাত্র ৩দিনের মধ্যে সমগ্র কুরাইশ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের বাহিনীতে ১০০০ সৈন্য, ২০০ ঘোড়া, ৬০০ বর্মধারী এবং সারী গায়িকা ও বাঁদীদল তাদের বাদ্যযন্ত্রসহ বদর অভিমূখে রওয়ানা হলো। প্রত্যেক মনজিলে তথা বিরতীতে তাদের খাবারের জন্য ১০টি করে উট জবাই করা হতো।

অপরদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবেলা করার অনুপাতে প্রস্তুতি নিয়ে ২য় হিজরীর ১২ রমজান শনিবার মদীনা থেকে রওয়ানা হন। কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর বদরের নিকট এসে পৌছে দু'জন সাহাবীকে আবু সুফিয়ানের সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন। (মাযহারী) সংবাদ বাহক ফিরে এসে জানালেন যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কুরাইশরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ও মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। মুশরিকদের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিল আবু জেহেল ইবনে হিশাম। (ইবনে কাসীর)

এই অনাকাংখিত পরিস্থিতি এবং অবশ্যম্ভাবী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মুকাবিলা কিভাবে করা যায়, এ নিয়ে তিনি উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শ বৈঠক আহবান করলেন। মুহাজিরগণের মধ্যে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) তাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করলেন। অতঃপর মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) দাঁড়িয়ে তেজস্বিনী ভাষায় বললেন,

يارسول الله امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.

'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর দেখানো পথে আপনি এগিয়ে চলুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে ঐরূপ বলব না, যেরূপ বনু ইস্রাঈল তাদের নবী মূসাকে বলেছিল যে, 'তুমি ও তোমার রব যাও যুদ্ধ করগে! আমরা এখানে বসে রইলাম' (মায়েদাহ ৫/২৪)। বরং আমরা বলব, اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون 'আপনি ও আপনার রব যান ও যুদ্ধ করুন, আমরা আপনাদের সাহায্যে যুদ্ধরত থাকব'। لو الذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجادلنا معك من دونه حتى تبلغه সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে আবিসিনিয়ার 'বারকুল গিমাদ' (برك الغماد) পর্যন্ত চলে যান, তবে আমরা অবশ্যই আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাব'। মিক্বদাদের এই জোরালো বক্তব্য শুনে আল্লাহর রাসূল খুবই প্রীত হ'লেন এবং তার জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন' (دعا له بخير)।

সংখ্যালঘু মুহাজিরগণের উপরোক্ত তিন নেতার বক্তব্য শোনার পর সংখ্যাগুরু আনছারদের পরামর্শ চাইলে আউস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) বললেন, হে রাসূল! আপনি হয়ত আশংকা করছেন যে, আমাদের সঙ্গে আপনার চুক্তি অনুযায়ী আনছারগণ কেবল (মদীনার) শহরে অবস্থান করেই আপনাদের সাহায্য করা কর্তব্য মনে করে। জেনে রাখুন, আমি আনছারদের পক্ষ থেকেই বলছি, যেখানে ইচ্ছা হয় আপনি আমাদের নিয়ে চলুন। যার সঙ্গে খুশী আপনি সন্ধি করুন বা ছিন্ন করুন- সর্বাবস্থায় আমরা আপনার সাথে আছি। যদি আপনি অগ্রসর হয়ে হাবশার বারকুল গিমাদ পর্যন্ত চলে যান, তাহ'লে আমরা আপনার সাথেই থাকব।

والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك আর যদি আমাদেরকে নিয়ে আপনি এই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তবে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব'। ما تخلف منا رجل واحد– فسر بنا على بركة الله 'আমাদের একজন লোকও পিছনে থাকবে না। অতএব আপনি আমাদের নিয়ে আল্লাহর নামে এগিয়ে চলুন'। হযরত সা'দের উক্ত কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই খুশী হ'লেন ও উদ্দীপিত হয়ে বললেন, سيروا وابشروا فان الله تعالى قد وعدنى إحدى الطائفتين والله لكانى الآن انظر إلى مصارع القوم 'চলো এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে দু'টি দলের কোন একটির বিজয় সম্পর্কে ওয়াদা দান করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি এখন ওদের বধ্যভূমিগুলো দেখতে পাচ্ছি'।

যুদ্ধের ফলাফল : এ ছিল এক অসম যুদ্ধ। একদিকে সত্যের পক্ষে মাত্র ৩১৩ জন যোদ্ধা, প্রায় নিরস্ত্র। সঙ্গে দুটি ঘোড়া, ৭০টি উট আর যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অল্প কয়েকটি ঢাল-তরবারি। অপরদিকে সশস্ত্র ১ হাজার যোদ্ধার নিয়ন্ত্রণে ১০০ ঘোড়া আর ৭০০ উট। এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ৬জন মুহাজির ও ৮ জন আনছার শহীদ হন। কাফের পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দী হয়। তাদের বড় বড় ২৪ জন নেতাকে বদরের একটি পরিত্যক্ত দুর্গন্ধময় কূপে (القليب) নিক্ষেপ করা হয়। তাদের মধ্যে হিজরতের প্রাক্কালে মক্কায় রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী আবু জাহল সহ ১৪ নেতার ১১ জন এই যুদ্ধে নিহত হয়। বাকী তিনজন আবু সুফিয়ান, জুবায়ের বিন মুতব'ইম ও হাকীম বিন হেযাম পরে মুসলমান হন।

এরপরও মক্কার কাফের ও মদিনার ইহুদিদের সঙ্গে মক্কা বিজয় পর্যন্ত উহুদ, খন্দক, খয়বরের মতো আরও কটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নামতে হয় মুসলমানদের।

আবু জেহেলকে হত্যা করলেন দুই শিশু সাহাবী: কুরাইশ নেতা আবু জেহেল তার সৈনিকদের ছত্রভঙ্গ দেখে সে বার বার সাহস দিতে লাগলো। কিন্তু সময় যত যাচ্ছে তার সৈনিকরা প্রতিরোধের পরিবর্তে একের পর এক নিহত হচ্ছে। সে লাত ও ওযযা দেবতার শপথ নিয়ে বলেন, আমরা ফিরে যাব না যতক্ষণ না মুসলমানদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলবে। কিন্তু আবু জেহেলের অহঙ্কার কোন কাজে আসল না। বরং আবু জেহেল দুই শিশুর হাতে নিহত হয়। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন : বদর যুদ্ধের দিন আমি কাতারের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ মোড় নিয়ে দেখি ডানে বায়ে দু'জন আনসার কিশোর। তাদের উপস্থিতিতে আমি আশ্বস্ত হলাম না। তখন একজন চুপি চুপি আমাকে বললো, চাচা আমাকে আবু জেহেলকে একটু দেখিয়ে দিন। আমি বললাম, ভাতিজা তুমি তার কি করবে? সে বলল, আমি শুনেছি আবু জেহেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে গালি দেয়। সে সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি আমি আবু জেহেলকে দেখতে পাই তবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তার কাছ থেকে আলাদা হব না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু আগে লেখা হয়েছে, তার মৃত্যু না হয়। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন- এ কিশোরের কথা শুনে আমি হতবাক হলাম। ইতিমধ্যে তাদের অপরজনও আমাকে ইঙ্গিতে তার প্রতি নিবিষ্ট করে একই কথা বলে। কিছুক্ষণ পর আমি আবু জাহেলকে লোকদের মধ্যে বিচরণ করতে দেখে আনসার কিশোরদ্বয়কে বললাম, ঐ দেখ তোমাদের শিকার। যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। এ কথা শুনামাত্র আনসার কিশোরদ্বয় আবু জাহেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে। হত্যা করার পর তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে ফিরে আসে। তিনি কিশোর দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আবু জেহেলকে হত্যা করেছ? দু'জনই বলল আমি। তিনি বললেন, তোমরা কি নিজ তলোয়ারের রক্ত মুছে ফেলেছো? তারা বলল না, মুছিনি। তিনি উভয় কিশোরের তলোয়র দেখে বললেন, তোমরা দু'জনই তাকে হত্যা করেছো? অবশ্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহেলের জিনিসপত্র মায়ায ইবনে আমর ইবনে জামুহকে প্রদান করেন। এ দুই কিশোর সাহাবীর নাম ছিল, মা'য়ায ইবনে আমর ইবনে জামুহ এবং মা'য়ায ইবনে আফরা (রা.)। (সহীহ বুখারী শরীফ, ১ম খ-, পৃষ্ঠা : ৪৪৪, ২য় খ-, পৃষ্ঠা : ৫৬৮ এবং মিশকাত- ২য় খ-, পৃষ্ঠা : ৩৫২)।

শহীদদের দাফন ও কাফিরদের কূপে নিক্ষেপ: যুদ্ধ শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদদের আলাদা একটি স্থানে দাফন করেন। অন্যদিকে নিহত মুশরিকদের একটি নোংরা কূপের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দেন। হজরত আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশে বদরের দিন কুরাইশদের ২৪ জন বড় সর্দারের লাশ বদরের একটি নোংরা কূপে নিক্ষেপ করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিয়ম ছিল তিনি যুদ্ধে জয়ী হলে তিন দিন যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করতেন। বদরের মাঠে তিন দিন কাটানোর পর তার নির্দেশে সওয়ারীর পিঠে আসন সাঁটা হয়। এরপর তিনি পদব্রজে চললেন। সাহাবীরা তাকে অনুসরণ করেন। তিনি কূপের তীরে এসে থেমে কূপে নিক্ষিপ্তদের বাপের নাম নিয়ে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক, তোমরা যদি আল্লাহতাআলা ও তার রাসূলের আনুগত্য করতে, তবে সেটা কি তোমাদের জন্য ভালো হতো না? আল্লাহতাআলা আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন আমরা তার সত্যতা পেয়েছি। তোমরা কী তোমাদের প্রতিপালকেরকৃত ওয়াদার সত্যতা পেয়েছ? হজরত ওমর বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এমন সব দেহের সাথে কি কথা বলছেন? যাদের রূহই নেই। তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ, আমি যা কিছু বলছি, তা তোমরা ওদের চেয়ে বেশি শুনতে পাও না। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা ওদের চেয়ে বেশি শ্রবণকারী নও, কিন্তু এরা জবাব দিতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম : মিশকাত, ২য় খ- পৃ. ৩৪৫)।

গনীমতের মাল বণ্টন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ী বেশে মদিনায় ফিরে আসলেন তখনও গনীমতের সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা অবতীর্ণ হয়নি। আসহাবে বদরের মধ্যে গনীমতের সম্পদ নিয়ে মতবিরোধী দেখা দিল। যারা গনীমতের সম্পদ জমা করছিলেন তারা বললেন এ সম্পদ তাদের। কেউ বললেন, আমরা যুদ্ধ করে কাফিরদের তাড়িয়ে দিয়েছি তাই আমাদের প্রাপ্য। কেউ বলেন, আমরা নবীজীর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলাম

গনীমত আমাদের। এভাবে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে মতবিরোধ দেখা দিল। এ ব্যাপারে ইবনে ইসহাক হজরত উবাদাহ বিন সামিত (রা.)-এর সনদে বর্ণনা করেন, হযরত উবাদাহ (রা.) বলেন, সূরা আনফাল আমাদের কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। যখন আমরা গনীমতের মাল বণ্টন নিয়ে বিতর্ক শুরু করে দিলাম। আল্লাহতায়ালা তা আমাদের নিয়ন্ত্রণ হতে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইচ্ছাধীন করে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সকল মুসলমানের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

যুদ্ধে অংশ না নিয়ে গনীমত পেলেন যারা: ইবনে আসীর (রা.) বলেন, গনিমতের মাল বণ্টনের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন আটজন সাহাবীকে প্রদান করেন যারা যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। তাদের এ কারণে দেন যে, তারা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বদরের যুদ্ধে সহযোগিতা করছিলেন যদিও সরাসরি যুদ্ধে যাননি। তারা হলেন ১. হযরত উসমান বিন আফকান (রা.), ২. হজরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.), ৩. সাঈদ বিন যায়েদ (রা.), ৪. হজরত আবু লুবাবা (রা.), ৫. হজরত আসিব বিন আলী (রা.), ৬. হজরত হারিস বিন হাতিব (রা.), ৭. হজরত হারিস বিন সাম্মাহ (রা.), ৮. হযরত খাওয়াত বিন জুবাইর (রা.)।

বদর যুদ্ধের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও শিক্ষা: বদর যুদ্ধ ইসলাম ও মুসলমানের প্রথম সামরিক বিজয়। নিঃসন্দেহে এটি ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ বিজয় মুসলমানদের মনে অধিক সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আত্ম প্রত্যয়ের সূচনা করে। বদর বিজয়ের পর মদিনাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করতে থাকে। বদরের যুদ্ধে ইসলামের চূড়ান্ত সামরিক বিজয়ের পথ নির্মিত হয়।

বদর ইসলাম ও মুসলমানের জয়ের ইতিহাস। বদর হলো অধিক সংখ্যক কাফেরের ওপর স্বল্পসংখ্যক মুমিনের সফলকাম হওয়ার ইতিহাস। বদর হলো আত্মত্যাগের ইতিহাস। বদর হলো শাহাদাতের সূচনার ইতিহাস। বদর হলো যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতা দিয়ে মুমিনদেরকে আল্লাহর সাহায্য করার ইতিহাস। ইসলামের আত্মশুদ্ধি, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য, সাধনা, প্রার্থনা, সেবা, আত্মনিবেদন ও সংগ্রামের সব অধ্যায় যে একই সূত্রে গাঁথা, তার এক মহান স্বাক্ষর দ্বিতীয় হিজরির এই ১৭ রমজান।

এ যুদ্ধ ছিল আকিদা বিশ্বাসের শক্তির পরীক্ষা। নীতির প্রশ্নে আপস চলে না। এ যুদ্ধ ছিল তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বদর যুদ্ধকে কঠিন যুদ্ধ বলা হয়। কারণ, যুদ্ধের ময়দানে পক্ষ-বিপক্ষ ছিল একে অপরের আত্মীয়। পিতার বিরুদ্ধে পুত্র, পুত্রের বিরুদ্ধে পিতার লড়াই। অন্যায়কে বিতাড়িত করতে কোষযুক্ত তরবারি কোষমুক্ত করা হয়। ঈমানের কাছে রক্তের বন্ধন কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি মুসলমানদের। বরং তারা ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে বাতিলকে প্রতিরোধ করতে প্রাণপণ লড়াই করে কাফিরদের হত্যা করেছেন এবং কেউ কেউ শাহাদাতের অমীয় পেয়ালা পান করেছেন। আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিঃস্বার্থভাবে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লে বিশাল বাহিনীর কাছ থেকে ক্ষুদ্র দল বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনতে পারে- বদর যুদ্ধ তার চাক্ষুস প্রমাণ। বদর যুদ্ধ যুগ যুগ ধরে ইসলাম ও মুসলমানের প্রেরণা হয়ে কাজ করে আসছে এবং কাজ করে যাবে। ইসলাম টিকে থাকবে, না কাফিররা তাদের অসত্য-অন্যায় নীতি টিকিয়ে রাখবে এ যুদ্ধ ছিল চূড়ান্ত ফয়সালা। বদর যুদ্ধের মহান বিজয়ে মুসলমানদের ইমানের চেতনা বহুগুণে বেড়ে যায়। এই বিজয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

ইতিহাসে যতগুলো যুদ্ধ মুসলমানদের সাথে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কিংবা বিধর্মীদের সাথে সংঘটিত হয়েছে, তার মধ্যে বদরের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বদরের যুদ্ধের তাৎপর্য ছিল ঐতিহাসিক। বদরের যুদ্ধ ছিল ইতিহাস নির্ধারণকারী একটি যুদ্ধ। যদি বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হতেন তাহলে দ্বীন ইসলামের ভাগ্যে কী ছিল কিংবা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম ডাকার মতো কোনো লোক এই পৃথিবীতে থাকত কি না তা কেবল সেই মহান সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারো জানা ছিল না। শত্রুগণের দৃষ্টিতে বদরের যুদ্ধ ছিল উদীয়মান বা নবঅঙ্কুর, সবেমাত্র চারা গজাচ্ছে এই ইসলাম নামক ধর্মটিকে আল্লাহর জমিন থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার যুদ্ধ। নিম্নে সংক্ষেপে বদর যুদ্ধের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও শিক্ষা তুলে ধরা হলো:

বদর যুদ্ধের গুরুত্ব :

১. এটিই ছিল মুসলমানদের সাথে মুশরিকদের সর্বপ্রথম মুখোমুখি সশস্ত্র সংঘর্ষ।

২. এটি ছিল ইসলামের টিকে থাকা না থাকার ফায়সালাকারী যুদ্ধ।

৩. এটি ছিল হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী তথা একটি অসম যুদ্ধ। কেননা একটি সুসজ্জিত এবং সংখ্যায় তিনগুণ অধিক ও প্রশিক্ষিত সেনাদলের সাথে অপ্রস্তুত, অসজ্জিত এবং সংখ্যায় তিনগুণ কম এবং বাস্তুভিটা হারা মুহাজির ও নওমুসলিম আনছারদের এ যুদ্ধে জয় লাভ ছিল এক অকল্পনীয় ব্যাপার। এ কারণেই এ যুদ্ধের দিনটিকে পবিত্র কুরআনে 'ইয়াওমুল ফুরক্বান' বা ফুরক্বান ও ইসলামের মধ্যে 'ফায়সালাকারী দিন' (আনফাল ৮/৪১) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৪. বদরের এ দিনটিকে আল্লাহ স্মরণীয় হিসাবে উল্লেখ করে বলেন,

ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন বদরের যুদ্ধে। অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। অতএব আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হ'তে পার' (আলে ইমরান ৩/১২৩)।

৫. বদরের যুদ্ধ ছিল কাফেরদের মূল কর্তনকারী ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা দানকারী। এ যুদ্ধের পরে কাফের সমাজে এমন আতংক প্রবেশ করে যে, তারা আর কখনো বিজয়ের মুখ দেখেনি।

৬. এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে মুসলমানদের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পায়। দলে দলে লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এমনকি মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলে বাধ্য হয়। শত্রুরা ভীত হয়ে চুপসে যায়।

৭. বদরের যুদ্ধের বিজয় ছিল মক্কা বিজয়ের সোপান স্বরূপ। এই সময় শা'বান মাস থেকে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তিত হয় এবং বদর যুদ্ধের মাত্র ছয় বছর পরেই ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান তারিখে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যা পূর্ণতা লাভ করে।

বদর যুদ্ধের শিক্ষা : ১. মক্কায় পরিবেশ প্রতিকূলে থাকায় সেখানে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে মদীনায় পরিবেশ অনুকূলে থাকায় এবং এখানে সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব মেনে নিতে মৌখিক ও লিখিতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার ফলে মুসলমানেরা চালকের আসনে থাকায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। এতে বুঝা যায় যে, বিজয়ের সম্ভাবনা ও পরিবেশ না থাকলে যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়ে ছবর করতে হবে। যেমনটি মাক্কী জীবনে করা হয়েছিল।

২. বদরের যুদ্ধ ছিল মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক। আবূ জাহলকে বদরে মুকাবিলা না করলে সে সরাসরি মদীনায় হামলা করার দুঃসাহস দেখাত। যা ইতিপূর্বে তাদের একজন নেতা কূরয বিন জাবের ফিহরী সরাসরি মদীনার উপকণ্ঠে হামলা করে গবাদিপশু লুটে নেবার মাধ্যমে জানিয়ে গিয়েছিল। এতে বুঝা যায় যে, আত্মরক্ষা এবং ইসলামের স্বার্থ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি নেই।

৩. সংখ্যা ও যুদ্ধ সরঞ্জামের কমবেশী বিজয়ের মাপকাঠি নয়। বরং আল্লাহর উপরে দৃঢ় ঈমান ও তাওয়াক্কুল হ'ল বিজয়ের মূল হাতিয়ার। পরামর্শ সভায় কয়েকজন ছাহাবী বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে যুদ্ধ না করে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলে আল্লাহ ধমক দিয়ে আয়াত নাযিল করেন (আনফাল ৮/৫-৬)। এতে বুঝা যায়, আল্লাহর গায়েবী মদদ লাভই হ'ল বড় বিষয়।

৪. যুদ্ধের উদ্দেশ্য হ'তে হবে জান্নাত লাভ। যেটা যুদ্ধ শুরুর প্রথম নির্দেশেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। অতএব চিন্তাক্ষেত্রের যুদ্ধ হৌক বা সশস্ত্র মুকাবিলা হৌক ইসলামের সৈনিকদের একমাত্র লক্ষ্য থাকতে হবে জান্নাত লাভ। কোন অবস্থাতেই দুনিয়া হাছিলের জন্য মুসলমানের চিন্তাশক্তি বা অস্ত্র শক্তি ব্যয়িত হবে না।

৫. শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধে নামলে আল্লাহ স্বীয় ফেরেশতা মন্ডলী পাঠিয়ে সরাসরি সাহায্য করে থাকেন। যেমন বদর যুদ্ধের শুরুতে রাসূলের বালু নিক্ষেপের মাধ্যমে (আনফাল ৮/১৭) অতঃপর ফেরেশতাদের সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছিল (আনফাল ৮/৯)।

৬. যুদ্ধে গনীমত লাভের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জিত হ'লেও তা কখনোই মুখ্য হবে না। বরং সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সেনাপতির অনুগত থাকতে হবে। বদর যুদ্ধে গনীমত বণ্টন নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হ'লেও তা সাথে সাথে নিষ্পত্তি হয়ে যায় রাসূলের নির্দেশে এবং আয়াত নাযিলের মাধ্যমে (আনফাল ৮/১)।

বদর যুদ্ধের তাৎপর্য: ইসলামের ইতিহাসের বদরের যুদ্ধের তাৎপর্য ও বিজয় অবিস্মরণীয়। কারণ বদরের যুদ্ধের জয়লাভের ফলে একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের পরবর্তীতে রূপ চলে আসে। ইসলাম সত্য, মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বাণী নিয়ে পৃথিবীতে তাশরিফ এনেছেন তার বাস্তবতা ফুটে উঠে। সর্বোপরী মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস তৈরী হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ যুদ্ধ সত্য মিথ্যার পার্থক্য তৈরি করে দেয়। যুদ্ধ অস্ত্র, সৈনিক ও বাহু বলের দ্বারাই শুধু জয়লাভ সম্ভব নয় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, আত্মবিশ্বাস, ঐক্যতা ও সঠিক নেতৃত্ব এবং যুদ্ধাস্ত্র দ্বারাই বিজয় সম্ভব।

বদর যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে মদিনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করল একটি ইসলামী রাষ্ট্র। ইসলামের সমুদীপ্ত প্রদীপ ছড়িয়ে পড়ল আরবের আনাচে-কানাচে। অন্যদিকে মক্কার অহঙ্কারী মুশরিকরা চরম পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে গেল। আজ দুনিয়ার মুসলমানদের বদরের চেতনা নিয়ে জেগে ওঠার সময় এসেছে। দুনিয়ার মজলুম মুসলমান নর-নারী, শিশু, আবাল-বৃদ্ধ সবাই চিৎকার করে ডাকছে তাদের রক্ষা করার জন্য।

মদীনায় শুরু হলো ইসলামী প্রজাতন্ত্র ও ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সে রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি। ঈমান ও ইসলামের কাছে দুনিয়ার কোনো কিছুই কিছু না- মুমিন মুসলমানগণ তা বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন ঐতিহাসিক বদর প্রান্তে।

বদর যুদ্ধের অভূতপূর্ব বিজয়ে মুসলমানদের ভিত দৃঢ়তর হয়। এরপরও মক্কার কাফের ও মদিনার ইহুদিদের সঙ্গে মক্কা বিজয় পর্যন্ত উহুদ, খন্দক, খয়বরের মতো আরও ক'টি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুসলমানদের নামতে হয় বাধ্য হয়ে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় মক্কা বিজয়ের পরও আরও কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজানে সংঘটিত বদর যুদ্ধের তাৎপর্য সবসময়ই অনন্য মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। বদর যুদ্ধে নিবেদিত মুজাহিদ সাহাবিদের সবসময়ই গণ্য করা হয় সবচেয়ে মর্যাদাবান শ্রেণী হিসেবে। যাদেরকে বলা হয়, বদরী সাহাবী।

ইসলামের অস্তিত্বের প্রথম সকালে ধেয়ে আসা অন্ধকারের ঝড়ের মুখে আত্মনিবেদনের যে উজ্জ্বল অনুশীলন বদরের প্রান্তরে সাহাবিরা করেছেন, তার সঙ্গে রমজানের আত্মনিয়ন্ত্রণ, সংযম ও আল্লাহর হুকুমের সামনে আত্মবিসর্জনের অপূর্ব এক সাদৃশ্য বিদ্যমান। ইসলামে জিহাদ যে কেবল জয়ের জন্য যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধ প্রস্তুতি মাত্র নয়, রক্ত ও মৃত্যুর বিভীষিকা যে জিহাদের মূল চিত্র ও চেতনা নয়, বদরের প্রান্তরে প্রার্থনার কান্না, যুদ্ধকালে রোজা রেখে ক্ষুধার্ত থাকা আর শান্তি ও সত্য প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ধরে রাখার মধ্য দিয়ে 'বদর যুদ্ধ' তার এক উজ্জ্বল মানবিক রূপ উপহার দিয়েছে।

রমজান মনুষ্যত্ব ও আল্লাহর দাসত্বকে অস্তিত্বে ধারণ এবং লালন করার যে শিক্ষা দিয়ে যায়, রোজা ফরজ হওয়ার প্রথম বছর দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজানে তারই এক চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল। ইসলামের আত্মশুদ্ধি, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য, সাধনা, প্রার্থনা, সেবা, আত্মনিবেদন ও সংগ্রামের সব অধ্যায় যে একই সূত্রে গাঁথা, তার এক মহান স্বাক্ষর দ্বিতীয় হিজরির এই ১৭ রমজান। বদর যুদ্ধের এই সামগ্রিক শিক্ষা বিকশিত হোক প্রত্যেক মুসলমানের অন্তর ও জীবনে।

হালাল উপার্জন ও হারাম বর্জনে ইসলাম

মাওলানা মোহাম্মদ জিয়াউল হক রেযভী
প্রভাষক, আল্ কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা,চট্টগ্রাম।
পি-এইচ.ডি গবেষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

পবিত্র কুরআনুল কারীম আমাদের ইসলামী আইনগ্রন্থ। মানবজীবনের ইহ-পর জগত সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার জন্য একটি সত্য ও বাস্তবমূখী ঐশী গ্রন্থ। একজন মুসলিম তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পার্থিব জগতকে পরজগতের জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার সুন্দর দিক নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে এ গ্রন্থে। পরকালের একমাত্র মুক্তির নিশ্চয়িতা ঘোষণা করতে পারে আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ট এ গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থের সূচনাতেই হিদায়াত ও মুক্তির কথা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, الم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین "আলিফ লাম মীম, এ কিতাবে কোন ধরণের সন্দেহ নেই।"[১] একজন মুসলিম ঈমান গ্রহণের সাথে সাথে তার ওপর আবশ্যক হয়ে যায়, হালাল উপার্জন করা এবং হারাম বস্তু বর্জন করা। তার সমূহ বৈধতা পাওয়ার নির্ভর করে তার উপার্জন হালাল হওয়ার উপর। তাইতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হালাল উপার্জন করা ফরযের একটি প্রকার বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, طلب کسب الحلال فریضة بعد الفریضة "ফরযসমূহের একটি হলো হালাল উপার্জন অনুসন্ধন করা।[২] কুরআন ও হাদীসের আলোকে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব এবং হারাম বর্জনে অনুৎসাহিত বিষয়ের ওপর একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

হালাল'র পরিচয় : হালাল শব্দটি আরবী। শাব্দিক অর্থ বৈধ ও উন্মুক্ত হওয়া। এটির প্রকৃত অর্থ গিঠ খোলা।[৩] শরী'আতের পরিভাষায়- ইসলামী শরী'আতে অনুমোদিত ও বৈধতাপ্রাপ্ত বিষয়াবলিকে হালাল বলে। যেসব বস্তু-সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করা দেয়া হয়েছে, তাতে যেন একটা গিঠই খুলে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর ওপর থেকে বাধ্যবাধ্যকতা সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমে শব্দটির ব্যবহার প্রচুরভাবে পরিলক্ষিত হয়।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلا لا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم عدو مبین "হে মানবমন্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। কারণ সে নিসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" [৪]

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন, یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله إن کنتم إیاه تعبدون. "হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার করা, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রিযক হিসেবে দান করেছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদার কর, যদি তোমরা তাঁর ইবাদাত কর[৫]।

৩. ইরশাদ হচ্ছে, یسالونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات "হে রাসূল, তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কি বস্তু তাদের জন্য হালাল? আপনি বলে দিন, তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করা হয়েছে।[৬]

হালালোপার্জনের বিধান ও গুরুত্ব : কুরআন ও হাদীস দ্বারা একথা সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত, প্রত্যেক মুসলিমের উপার্জন ফরয হওয়া। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াত দ্বারা হালাল উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করার সাথে সাথে তা মেনে নেয়া ফরয করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"হে মানবসকল, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার করা। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৭] আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের দান করেছেন অসংখ্য নি'আমাত। তিনি তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টি জগতের জন্য স্ব স্ব চাহিদানুপাতে রিযকের ব্যবস্থা করেন। হালাল বস্তু ও সামগ্রীও তাঁর

একটি বড় নি'আমত; যা অনুসন্ধান করা তার আবশ্যকীয় কাজ। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে,

يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلا لا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি রুযী হিসেবে দান করেছি এবং আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর।[৮]

সর্বোত্তম উপার্জন : আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির সৃষ্টির পূর্বক তার জীবনধারণের সমূহ কলা-কৌশল ও উপকরণও দান করেছেন। তাকে জ্ঞান বিবেক ও স্বয়ংক্রিয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করে অপরাপর সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এভাবে জীবনধারণের ক্ষেত্রে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আত্মনির্ভর ও স্বনির্ভর হিসেবে। তাই পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করে স্ব উপার্জনে ব্রতী হওয়াই আল্লাহর প্রিয় রাসূলের মহান শিক্ষা। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজ হাতে উপার্জিত বস্তু-সামগ্রীকে সর্বোত্তম উপার্জন বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত মিকদাদ ইবন মা'দী কারুবা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, প্রত্যেক ব্যক্তির তার স্ব উপার্জিত উপার্জনই শ্রেষ্ট উপার্জন। আর আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম নিজ হাতে উপার্জন করতেন।[৯] অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহা তা'আলা মুমিনদেরকে তার নবী-রাসূগণের উপার্জনের মত উপার্জন করতে আদেশ করেছেন। কেননা নবী-রাসূলগণ তাঁদের নিজ হাতে শ্রম ব্যয় করতেন এবং কষ্ট স্বীকার করে উপার্জন করতেন।[১০]

হালাল আহারে বরকত এবং হারাম খাদ্যে অকল্যাণ : আল্লাহ তা'আলা হালাল ও বৈধ বস্তু-সামগ্রীকে তাইয়্যিব তথা পুত-পবিত্র বস্তু বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র বস্তু আহার করার সাথে সাথে এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্যেও অনুপ্রাণিত করেছেন। কারণ হারাম খাদ্য আহার করলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও অসচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, ইবাদাতে আগ্রহ স্তমিত হয়ে আসে এবং দো'আ কবুল হয় না, তেমনি হালাল আহারে অন্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে অন্যায় ও অসচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এভাবে ইবাদাত বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, পাপের কাজে অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয় এবং দো'আ কবুল হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবী রাসূলের প্রতি হিদায়াত করেছেন,

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. "হে আমার রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং ভাল কাজ কর।[১১]

এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দো'আ কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যেও প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশঙ্কাই থাকে বেশি। এ প্রসঙ্গে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু' হাত তুলে ফরইয়াদ করে, হে প্রতিপালক, হে আমার রব! কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছদ অবৈধ উপার্জনে সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দো'আ কিভাবে সৃষ্টিকর্তার কাছে কবুল হতে পারে? অর্থাৎ হারাম উপার্জন হওয়াই তার কোন প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।[১২]

উপার্জনে অবৈধ উপায় : ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপার্জনের প্রক্রিয়া ও উপার্জিত বস্তু উভয় হালাল হওয়া আবশ্যক। তাই বৈধ বস্তুর উপার্জন হারম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হওয়া যেমন নিষিদ্ধ তেমনি অবৈধ বস্তুর উপার্জনও ইসলাম ধর্মে অনুমোদিত নয়। ইসলাম মানবতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ, শান্তিময় এবং সার্বজনীন ধর্ম। ব্যবসাকর্ম ও উপার্জনে পরস্পর প্রতারণার শিকার হওয়া অথবা শঠতা ও ধোঁকাবাজি দিয়ে অর্থ আয় করা ইসলাম ধর্ম সমর্থন কখনো করে না। যেমন সুদ, ঘুষ, জুয়া, অবৈধ লটারী, প্রতারণা, ওযনে কম দেয়া ও ভেজাল মিশানো, হারাম বস্তুর ব্যবসা, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই,জবর দখল এবং মজুতদারী ও কালোবাজারি ইত্যাদি। এভাবে হারাম বস্তুর ব্যবসা যেমন কুকুর, শুকর, সাপ,হিংস্র পশু পাখি, মদ, সিনেমা, অশ্লীল গানের ক্যাসেট, ভি.ডিও ক্যামেরা ও ছবি অংকন ইত্যাদি।

হারাম বর্জন : হারাম শব্দটি আরবী অভিধানে নিষিদ্ধ ও অবৈধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআন ও হাদীসে যে সকল বস্তু-সামগ্রী আহার করা, পানাহার করা, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং লেনদেন করা অনুমোদন দেয় নি একে বলা হয় হারাম।

হারাম বর্জনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি : একজন মুসলিমের তার ইবাদত-বন্দেগী ও যিকর আযকার আল্লাহ তা'আলার কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হল তার উপার্জন হারাম থেকে মুক্ত হওয়া। জীবনযাত্রা পরিচালনার ক্ষেত্রে ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যেমন ইহজাগতের মানুষ একমত তেমনি সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রেও ভাল মন্দ,হারাম-হালাল যাচাই -বাছাইয়ের অবকাশ রয়েছে। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক রাতারাতি বড় লোক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়;যদ্দরুণ তারা হালাম ও হারামের তোয়াক্কা করে না, যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। একজন মুসলিম সে ঘরে থাকুক কিংবা মসজিদে, বাজারে, কারখানায়, অফিস-আদালতে বা জমি চাষে যেখানেই থাকুক না কেন সবজায়গায় তাকে অবশ্যই রিযকদাতার অনুসরণ করতেই হবে। সে রিয্‌ক অবশ্যই শরী'আতসম্মত হওয়া বাঞ্চনীয়। তাই আল্লাহ তা'আলা হালাল রিয্‌কের সন্ধানে ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়তে আদেশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. "অতপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তথা হালাল রোযগারের সন্ধান করা।[১৩]

বর্তমান মুসলিম সমাজে নিম্ন বর্ণিত হারাম বিষয়াদির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে; যা অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

এক. সুদ : সুদ একটি ইসলামে শরী'আতে নিষিদ্ধ আর্থিক লেনদেন এবং হারাম বিষয়। বর্তমান মুসলিম সমাজে এ সুদের প্রথা ও ব্যবহার প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ কুরআনুল কারীম ও হাদীস নববীতে সুদ সর্ম্পকে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য আয়াত দ্বারা সুদের নিষিদ্ধতা, কঠোরতা, কুফল এবং ক্ষতির কথা তুলে ধরেছেন। যেমন :

* আল্লাহ তা'আলা বলেন, يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم "আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খায়রাতকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে ভালবাসেন না।"[১৪]

* ইরশাদ হচ্ছে, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا "সুদগ্রহণকারী লোকেরা কিয়ামতের দিন ঐ লোকদের মত দন্ডায়মান হবে যাদেরকে শয়তান তার স্পর্শ দিয়ে পাগল করেছে। এটা এ কারণে হবে, যেহেতু তারা পার্থিবজগতে বলত ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত। অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।[১৫]

* আল্লাহ তা'আলা বলেন, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।[১৬]

* আরো ইরশাদ হচ্ছে, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. "অতপর তোমরা যদি সুদের লেনদেন পরিত্যাগ না কর, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতিঅত্যাচার কর না এবং কেউ তোমাদেও প্রতি অত্যাচার করবে না।[১৭]

হাদীসে নববী : আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সুদের লেনদেনকে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে এর মারাত্মক পরিণতির কথাও তুলে ধরেছেন।

عن جابر' قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ' مؤكله وكاتبه ' وشاهديه ' وقال : هم سواء

"হযরত জারিব ইবন আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদলেখক এবং সদের উভয় সাক্ষীরে প্রতি লা'নত করেছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন, এ

সকল লোক সবই অপরাধে সমান।[১৮]

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره.

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আমার উম্মাতের নিকট এমন এক সময় আসবে, কোন লোকই সুদ গ্রহণ করা থেকে বাচতে পারবে না। কোন ব্যক্তি যদি স্ব ইচ্ছায় সুদ গ্রহণ না করলেও অন্য উপায়ে সে সুদের কবলে পড়ে যাবে।[১৯]

১. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الربا سبعون جزءا أيسرها أن الرجل أمه "হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, সুদের সত্তরটি অপরাধ আছে। সবচেয়ে কম অপরাধ হচ্ছে সুদগ্রহিতা যেন নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করা।" না'উযুবিল্লাহ...।[২০]

২. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا "হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, মি'রাজ রজনীতে আমি এমন কতিপয় মানুষ দেখলাম যাদেও পেট ঘরের মত বিশাল আকৃতি। এদের পেটসমূহে অনেক সাপ; যা বাহির থেকেই দৃশ্যমান। আমি হযরত জিব্রাঈল (আ.)কে এদের পরিচয় সর্ম্পকে জানতে চাইলে তিনি উত্তরে বললেন, এরা হলো সুদখোর। (অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা অবাধে সুদের লেনদেন করার কারণে এমন লাঞ্ছনাকর শাস্তি ভোগ করছে)।"[২১]

৩. من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به "নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, হারাম খাদ্যে লালিত দেহ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর হারামে লালিত শরীর দোযখেই অধিক উপযুক্ত।"[২২]

ঘুষের কুফল ও অপকারিতা : নিজের স্বার্থ বা প্রয়োজনীয় কাজ আদায় করতে গিয়ে অপরকে বাধ্য হয়ে বাড়তি টাকা পয়সা বা দ্রব্য-সামগ্রী আদায় করাকে ঘুষ বলে। ঘুষের লেনদেন যেমন ইসলামে নিষিদ্ধ তেমনি এটি মানবতা ও সমাজনীতিরও পরিপন্থী। সংক্রামিত এ ব্যাধি একটি সুস্থ ও ভারসাম্য সামজ ও রাষ্ট্রকে নিমিষেই ধ্বংস করে দেয়। ঘুষের লেনদেন সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ ও ক্ষোভ ও দূরত্ব জন্মায়। এর বিষবাষ্প মানবিক আচরণে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। পরম সহিষ্ণুতা, আত্মসম্মানবোধ, আন্তরিকতা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠ, লজ্জাশীলতা ও ন্যায় পরায়নতা ইত্যাদি মানবিক সুকুমার বৃত্তিগুলো ঘুষের প্রভাবে মানুষ হারিয়ে ফেলে। অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক ঘুষগ্রহিতা যে উপার্জন আদায় করে থাকে পবিত্র কুরআনুল কারীমে এর চরম নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. "তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।[২৩] ঘুষ গ্রহণ করা নিন্দনীয় ও পাপের কাজ। এতে একদিকে বান্দাহর হক নষ্ট হয় আবার অন্যদিকে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাও অসন্তুষ্ট হন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহিতা উভয়কে লা'নত করেছেন।[২৪] প্রখ্যাত হাদীসজ্ঞ ইমাম তাবরানীর বর্ণনায় পাওয়া যায়, ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহিতা উভয় জাহান্নামে যাবে। হযরত সাওবান (রা.) এর বর্ণিত হাদীসে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহিতা এবং ঘুষের দালাল সকলের উপর অভিসম্পাৎ করেছেন।

জুয়া ও লটারী : আরবী ভাষায় জুয়াকে মায়সার (ميسر) ও কিমার (قمار) বলা হয়। শরী'আতের পরিভাষায় যে খেলা লাভ ও ক্ষতির মধ্যে আবর্তিত থাকে এবং লাভ ও ক্ষতি কোনটাই স্পষ্ট নয়, তাকে জুয়া বলে।[২৫] বর্তমান কালে প্রাচীন পদ্ধতি ছাড়াও জুয়ার ক্ষেত্রে আরো বহু নতুন নতুন রূপ, প্রকার ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত

হয়েছে। যেমন হাউজী, টাকাবাজি রেখে ঘোড় দৌড় ও তাসখেলা ইত্যাদি। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, শুধু নাম পরিবর্তন করলে বস্তুর মূল এবং হুকম পরিবর্তন হবে না। তাই প্রাচীনকালে প্রচলিত জুয়া সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিল, বর্তমানকালের জুয়ার ক্ষেত্রে ও ঐ হুকম প্রযোজ্য হবে। নিম্ন বর্ণিত কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা জুয়া ও লটারী হারাম সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فا جتنبوه لعلكم تفلحون" হে ঈমানদারগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার দেবী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু ; যা শয়তানের কাজ (শরী'আতে নিষিদ্ধ)। অতএব তা থেকে তোমরা বিরত থাক; অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে।[২৬] নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন,

من قال لصاحبه : تعال أقامرك ' فليتصدق." কেউ যদি তার সাথীকে বলে, এসো জুয়া খেলব। তাহলে (এ কথার অপরাধের কারণে) সাদকা করা তার উপর অপরিহার্য।[২৭]

মিথ্যা ব্যবসা-বাণিজ্য : ব্যবসা-বাণিজ্য মানব জাতির জীবনধারণের অন্যতম উপকরণ। আল্লাহর প্রিয় হাবীব ব্যবসা এবং ব্যবসায়ীকে ভালবাসতেন অত্যধিক। তিনি বাল্যবয়সে আপন চাচা আবু তালিবের সাথে মক্কা থেকে সিরিয়া গমন করে ব্যবসায় অসাধারণ অভিজ্ঞতার্জন করে পরবর্তীতে তিনি পবিত্র মক্কা নগরীর একজন সফল, প্রতিষ্ঠিত ও আদর্শবান ব্যবসায়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ইসলামের প্রথম মহিয়সী নারী সাইয়্যিদাহ হযরত খদীজাতুল কোবরা (রা.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তার ব্যবসাকর্ম পরিচালনা করে ব্যবসানীতিকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে এর স্বচ্ছতা, সততা এবং সবাস্তবতায় এক নজির স্থাপন করেছেন আরব ভূ-খণ্ডে। সত্য ও হালাল ব্যবসায়ী তার সততা ও স্বচ্ছতার দরুণ পরকালে নবী-রাসূল, সিদ্দীক এবং শহীদদের সান্নিধ্য লাভ করবে। ইমাম তিরমীযী এবং ইমাম দারিমী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর বাচনিক বর্ণনা করেন, সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী পরকালে নবীগণ, সিদ্দীকীন এবং শহীদগণের সাথে মিলিত হবেন। তাই মুসলিম ব্যবসায়ীর উচিত, পার্থীব জগতের সামান্য লাভের অভিপ্রায় পরকালের স্থায়ী শান্তির বিনাশ না করা।

মিথ্য শপথ করে ব্যবসা বানিজ্যে উপার্জিত টাকা পয়সা কখনো হালাল হতে পারে না। মিথ্যুক ব্যাবসায়ী ইহ-পরকালে আল্লাহর দয়া ও রাহমত থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার লোকদের প্রতি কিয়ামতের দিন রাহমাতের দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদের দোষ-ত্রুটিও ক্ষমা করবেন না। আর তাদেও জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। বর্ণনাকারী সাইয়্যিদুনা হযরত আবুযার (র.) প্রিয় রাসূলের কাছে জানতে চাইলেন ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্থ এবং ধ্বংসশীল ব্যক্তি কারা? নবীজী উত্তরে ইরশাদ করলেন, তারা হল- এক. গর্ববেশে লুঙ্গি বা পায়জামা গোড়ালির নীচে পরিধানকারী, দুই. খোঁটা দানকারী, তিন. মিথ্যা শপথ করে যে বস্তু-সামগ্রী বিক্রয় করে।[২৮] আবার অপর হাদীসে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কঠোর হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেন, সাবধান! তোমরা ব্যবসাকর্মে অত্যাধিক শপথ করিও না, কেননা কিছুক্ষণের জন্য তা লাভবান হলেও তা পরক্ষণেই নষ্ট হয়ে যায়।[২৯] ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের স্ব রচিত সহীহাইনে বর্ণনা করেন, ব্যবসায় মিথ্যা শপথে দ্রব্য-বস্তু বিক্রি হলেও এর বিক্রয়লব্ধে ন্যূনতমও উপকার (বারকাত) আসে না।[৩০]

গুদামজাত করা : প্রত্যেক মুসলিম ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসাকর্মে সৎ ও জনকল্যাণ স্বার্থ নিহিত থাকা উচিত। একজন আদর্শ ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট্য হল দেশের জনগণ অনায়াসে এবং স্বল্প মূল্যে দ্রব্য-সামগ্রী লাভ করতে পারা এবং যতদূর সম্ভব বাজার মূল্য নির্ধারণ ক্রেতাদের সামর্থানুযায়ী হওয়া সেই দিকও বিবেচনা করা। নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বাজারে দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য চড়াদামে কেনার বাধ্য করত গুদামজাত করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মূলত এ সকল অসাধু ব্যবসায়ীরা দেশে, শহরে ও গ্রামে দ্রব্য-বস্তুর সংকট সৃষ্টি করার অপপ্রয়াসে এমন কর্ম করে থাকে। এসকল ওঁড়ামী ব্যবসায়ীরা আল্লাহ ও রাসূলের লা'নতপ্রাপ্ত। হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, দেশে খাদ্যসরবরাহকারী

রিযকপ্রাপ্ত এবং খাদ্যমজুদকারী লা'নৎপ্রাপ্ত।[৩১] হযরত ইব্ন 'উমার (রা.) প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হতে বর্ণনা করেন, عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه "যে ব্যক্তি জনগণের মধ্যে খাদ্য সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন যাবৎ দ্রব্য-বস্তু গুদামজাত করবে, সে আল্লাহ তা'আলার রাহমাত থেকে বঞ্চিত হবে এবং আল্লাহ তা'আলাও তার থেকে দায়মুক্ত হবেন।"[৩২]

ইসলাম নৈতিকতা ও মানবতার ধর্ম। নৈতিকতা ও মানবতার মহান নবী আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অনুসরণে রয়েছে আমাদের সার্বিক জীবন সুন্দর ও পরিমার্জিত করার উত্তম পাথেয়। হালাল উপার্জন ও হারাম বর্জনে তাঁর আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক করুক, আমীন।

তথ্যসূত্র:

১. আল্ কুরআন, ২: ১-২।
২. শায়খ ওয়ালী উদ্দীন আত্ তিবরীযী, মিশকা, পৃ. ৪৪২।।
৩. ড. ইব্রাহীম ও অন্যান্যরা, আল্ মু'জামুল ওয়াসীত্ব, পৃ. ১৯৩।
৪. আল্ কুরআন, ২: ১৬৮।
৫. আল্ কুরআন, ২: ১৭২।
৬. আল্ কুরআন, ৫: ৪।
৭. আল্ কুরআন, ২:১৬৮।
৮. আল কুরআন, ২ : ১৭২।
৯. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবিহ, পৃ. ২৪১।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. আল্ কুরআন, সূরা মুমিন, ৫০।
১২. তাফসীর ইবন কাসীর।
১৩. আল্ কুরআন, সূরা জুমু'আ : ১০।
১৪. আল্ কুরআন, ২: ২৭৬।
১৫. আল্ কুরআন, ২: ২৭৫।
১৬. আল্ কুরআন, ২: ২৭৮।
১৭. আল্ কুরআন, ২: ২৭৯।
১৮. ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদীস নং, ১৫৯৮।
১৯. মিশকাত শরীফ, সুদ অধ্যায়, পৃ. ২৪৫।
২০. প্রাগুক্ত।
২১. প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪৬।
২২. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং, ৫১৩০।
২৩. আল্ কুরআন, ২ : ১৮৮।
২৪. ইমাম আবূ দাউদ, সুনান।
২৫. জাওয়াহিরুল ফিক্হ, ২য় খন্ড, পৃ.৩৩৬।
২৬. আল্ কুরআন, ৫ : ৯০।
২৭. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, আস্ সহীহ, হাদীস নং. ৪৮৬০।
২৮. সহীহ মুসলিম, ইমাম মুসলিম।
২৯. প্রাগুক্ত।
৩০. মিশকাতুল মাসাবীহ্, পৃ. ২৪৩।
৩১. সুনান ইবন মাজাহ্,মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ২৫১।
৩২. মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ.২৫১।

ইসলামের আলোকে বিচার পদ্ধতি

এড. আনিসুল ইসলাম রায়হান
আইন বিষয়ক সম্পাদক- ইমাম বুখারি (রহ.) একাডেমি বাংলাদেশ

যেকোন রাষ্ট্রীয় ব্যাবস্থাপনায় জনগনের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে বিচার বিভাগের ভূমিকা আছে বলা যায়। বিচার ব্যাবস্থার মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার ও আইনের ব্যাখ্যা, বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসাসহ রাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক সমাস্যারই দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে বিচার বিভাগ। এজন্য বলা হয়ে থাকে, বিচার বিভাগ হলো সংবিধানের রক্ষাকবচ। বিচার বিভাগকে তার সুমহান অঙ্গীকার নিয়ে চলতে গেলে কী প্রক্রিয়ায় এগুতে হয় তার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পার্থিব জীবনে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা কায়েমে মহা নবীর সেই নির্দেশনার অনুসরণ ও চর্চা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ।

ইনসাফ ভিত্তিক বিচার প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। পানি আলো ও বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন দেশের প্রত্যেকটি মানুষই পেতে পারে, এ অধিকার হতে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না, তেমনি সুবিচারও প্রত্যেকটি মানুষেরই সমানভাবে প্রাপ্য। এ ব্যাপারে ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা এমনকি মুসলিম-অমুসলিমের মাঝেও কোনোরুপ পার্থক্য করা চলে না। বিচার ব্যাবস্থায় একজন বিচারকের ভূমিকা ও দায়িত্বের কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। ন্যায় বিচারক হিসেবে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় হত্যা মামলা, দেওয়ানী মামলা, ফৌজদারী মামলাসহ মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় প্রায় সকল বিষয়েই বিচার কার্য সম্পাদন করেছেন। তবে এসব বিচার কাজে তিনি ইলম, তাক্ওয়া ও প্রজ্ঞার বিষয়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। কারণ এসব গুণাবলির বদৌলতে একজন বিচারক লোভের উর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেন।

বিচার ব্যাবস্থায় বিচারক-বাদী-বিবাদী সর্ম্পকে কমবেশী আমরা সবাই পরিচিত, কিন্তু এ তিনটি প্রত্যয়ের মধ্যকার সর্ম্পক নিয়ে ততটা পরিচিত নই। ইসলামী আদলে বিচারের সময় বিচারক-বাদী-বিবাদী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরুপ একটি সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আলী! দুই পক্ষ যখন তোমার সম্মুখে বিচারের জন্য উপবিষ্ট হবে তখন এক পক্ষের কথা যেমন শুনছ তেমনি অন্য পক্ষের কথা না শুনে উভয়ের মধ্যে কোন ফয়সালা দিবে না। এ রকম নিয়ম তুমি পালন করলে তোমার জন্য সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারের পথ উদ্ভাসিত হবে। (আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযি শরীফ)

পবিত্র কুরআনে সূরা নাহলে বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার যে ঘোষণা এসেছে তাতে আদল বলতে বিচারের রায় দেয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের পক্ষে রায় দেয়াকে বুঝানো হয়েছে। (তাফসিরে বাহরে মুহী'ত)

আবার দন্ড কার্যকর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "সে দু'জনকে আল্লাহর আইনে দন্ড দানের ব্যাপারে তোমাদের যেন কোন রকম দয়া বা অনুগ্রহ পেয়ে না বসে। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হও"। (সূরা আন্ নূর)

পবিত্র কুরআনে আরো এরশাদ হয়েছে "আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোনো বিচার মীমাংসা করবে তখন ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক বিচার মীমাংসা করবে। (সূরা আন্ নিসা:৫৮)

ন্যায় বিচার সম্পর্কে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন " নিশ্চয় যারা ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করে আল্লাহর নিকট তারা নূরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে। এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা তাদের বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে পরিবার পরিজনের ব্যাপারে এবং যে সব দায়-দায়িত্ব তাদের উপরে অর্পণ করা হয়, সেসব বিষয়ে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার করে। (সহীহ মুসলিম)

বিচার কাজে সাক্ষ্য প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রেও আদলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আজকাল বিচার ব্যবস্থায় ভুয়া সাক্ষ্য, মিথ্যা সাক্ষ্য, সাক্ষ্য দাতাকে হুমকি-ধমকি নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। হযরত বারী'দাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, " তিন প্রকর বিচারক রয়েছে। তন্মধ্যে একজন মাত্র বেহেশতে যেতে পারবে, অপর দু'জন জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। সে বিচারক বেহেশতে যাবে যে প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেছে, অতপর তদানুযায়ি বিচার কর্ম পরিচালনা করেছেন। আর যে বিচারক প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেও ফয়সালা করার ব্যাপারে অবিচার ও যুলুম করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও জনগণের জন্য ফয়সালা করেছে সেও জাহান্নামি।

(আবু দাউদ শরীফ, ইবন মাজাহ শরীফ)

ইসলামী আইন বিধিতে ন্যায় বিচারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, আসামির পক্ষে তার নিকটবর্তী কোন আত্নীয় স্বজন সাক্ষ্য দিতে পারবে না। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ম চুরি হলে তার পুত্র হযরত ইমাম হাসন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং তার অধীনস্থদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নি । কেননা তারা উভয়ে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আপনজন ছিলেন। সুতরাং ইসলামী আইনে নিকটবর্তী কোন আত্নীয় স্বজনের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হয় না।

বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে হত্যা, ধর্ষণ এবং লুটতরাজের পাশাপাশি আরো নানা অপরাধ কর্ম সংঘটিত হচ্ছে, যেগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু গর্হিত কিংবা গোনাহ নয় বরং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরণের অপরাধ আবার ইহুদি নাসরাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে না বরং তথাকথিত ধর্মান্ধ ব্যক্তি এবং তাদের অনুগত কিছু অর্ধশিক্ষিত মুসলমানের দ্বারাই হচ্ছে। বর্তমানে কিছু ভ্রান্তবাদীরা তাদের মনগড়া ভ্রান্ত মতামত দিয়ে তরুণদের বিপদগামী করছে। শুধু তাই নয় বরং আগামী দিনগুলোর জন্য রাসূল বিদ্বেষী একটি অনুগত দল তৈরি করে যচ্ছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ, লূণ্ঠন ইত্যাদি বিচারের উপকরণ হলেও বিচর শব্দের উচ্চারণের সাথে হত্যার কথাটি অবলীলায় এসে যায়। কারণ হত্যা এমন একটি অপরাধ যা আল্লাহর কাছে কঠিন ও মারাত্নক গুনাহ হিসেবে বিবেচিত। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল তার বিখ্যাত 'মুসনাদে আহমদ' হাদিস গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যদি আসমান যমীনের সকল অধিবাসী একজন মুসলমানকে অবৈধভাবে হত্যা করার জন্য একমত পোষণ করে তবে আল্লাহ তাদের সবাইকে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন"। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, "কোন মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো অবৈধ হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত না হবে ততক্ষণ দ্বীনের পাকড়াও হতে মুক্ত থাকবে"। (বুখারি শরীফ)

অপর হাদিসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক করে নি এবং কোনো মুসলমানদের রক্ত নিয়ে বাহাদুরি (হত্যা) করে নি। তাহলে আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায় তাকে মাফ করে দেওয়া। বিগত ২০০১ সালে তালাকের ফত্ওয়াকে কেন্দ্র করে দেশে একটি শরিয়া বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া অনেক দূর এগিয়ে গিয়েও কেন জানি থেমে গিয়েছে। অনেকেই হয়তো আশংকা করেছিল, এধরণের উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে সমান্তরাল দুটি বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। এটি আসলে ঠিক নয়। শরীয়া বোর্ড হবে সুপারিশ মূলক, মুসলমান নাগরিকদের সাথে ধর্মীয় ব্যাপারে প্রকৃত ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব হবে শরীয়া বোর্ডের।

পরিশেষে বলতে পারি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ শিক্ষা দিয়েছেন, বিচারের ব্যাপারে কোনো পক্ষপাতিত্বের সুযোগ ইসলামে নেই। আমাদের প্রচলিত বিচার ব্যাবস্থায় পক্ষপাতমূলক বিচারের নির্যাতিত গোষ্ঠী আজ দেখতে চায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা। আজ দেশবাসীর দাবি বিচারকদের জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি প্রণয়ন করা, তারা ধর্মান্ধ না হয়ে মানবতার ও নিরপেক্ষতার প্রতীক হোক। কাজেই আমরা বলতে পারি মহনবী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বিচারের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো বিচারক যদি মূল্যবোধের চর্চা করেন এবং সে অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনা করেন কেবল তখনই একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা কায়েমের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।

ইমাম বুখারি (রহঃ) একাডেমি বাংলাদেশ'র সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং

ক্রম	নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
০১	মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন	লালখান বাজার	
০২	মোহাম্মদ শাহিনুল ইসলাম	শামসী কলোনী	০১৯২৫৬২৫৩৯৩
০৩	মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	ওয়াসা	০১৭৭০০০২৪৯৪
০৪	মোহাম্মদ আলী	ওয়াসা	০১৮৪৮০১১৬১৩
০৫	মোহাম্মদ পারভেজ	ওয়াসা	০১৮১৭৭৬০৯৬২
০৬	মোহাম্মদ আব্দুল গফুর	হাই লেভেল রোড়	০১৮৩৩৭৬৫৬৭৪
০৭	মোহাম্মদ কামাল উদ্দীন	দামপাড়া	০১৯১৪৯৩৫৩৪৫
০৮	মোহাম্মদ তানভীর উদ্দীন	জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া	০১৮৩৫৫৬০০৬৫
০৯	হাফেজ মোহাম্মদ তামাম হাসান	বাকলিয়া	০১৮১২০১৬১৪২
১০	হাফেজ মোহাম্মদ হাছবী	বাকলিয়া	০১৮৩৬১৬৬১৬৭
১১	মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম নেকী	বাগঘোনা	০১৮৩২৮১০৬৩০
১২	মোহাম্মদ ফোরকান উল্লাহ	জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া	০১৮১৮৩১৮২১৮
১৩	মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দীন	দামপাড়া	০১৮২২৪৮৩৬৭২
১৪	মাওলানা মোহাম্মদ আবুল হাসান	লালখান বাজার	০১৮১৮৮৫২৮০২
১৫	মোহাম্মদ শরীফ বিন আজাদ তোহা	লালখান বাজার	০১৮৫১২১২৪০০
১৬	মোহাম্মদ আবু তাহের	হাদুমাঝি পাড়া	০১৮৪৩৫৭৪০৭০
১৭	মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন জনি	মুরাদপুর	০১৮১৯৩৪৯৫৩০
১৮	মোহাম্মদ ফখরুদ্দীন	মুরাদপুর	০১৮১৯৩৩৫২২৩
১৯	মোহাম্মদ রবিউল হোসেন	মুরাদপুর	০১৭৭২৫৬৬০৬৬
২০	হাফেজ মোহাম্মদ ইদ্রিস	এনায়েত বাজার	০১৮১৫০৬৯২০১
২১	মোহাম্মদ আকতার হোসেন	পলিটেকনিক্যাল	০১৮৪৮০৫৯৪০৮
২২	মোহাম্মদ রেজাউল করিম	বন্দরটিলা	০১৭৩০৯৪৮৮৩৫
২৩	মোহাম্মদ আবদুল করিম	হাদুমাঝি পাড়া	০১৮২৭৬১১৯৭৪
২৪	মোহাম্মদ আবুল কাশেম	বিবিরহাট	০১৮১৪২৩৮১৬১
২৫	হাফেজ মোহাম্মদ আবু তৈয়ব	লালখান বাজার	০১৮৪৩৭৭৪৪২৯
২৬	হাফেজ মোহাম্মদ বেলাল	জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া	০১৮১৪৪৬৩৯০১

সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং

ক্রম	নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
২৭	শেখ মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা	মুরাদপুর	০১৮৩৭৯২৯৬৪২
২৮	কাজী মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ রাইয়ান	আগ্রাবাদ	০১৮৫৬৩১৯৬২৬
২৯	মোহাম্মদ নুরুল কবির রাজ	লালখান বাজার	০১৮৫৭৫৩১৩২৩
৩০	হাজী মোহাম্মদ কুতুবী	লালখান বাজার	০১৭২৮২৬২৪২৪
৩১	মোহাম্মদ ইউছুফ জামান	লালখান বাজার	
৩২	মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম রিয়াদ	লালখান বাজার	০১৬৭৯২৭৯৭৪৯
৩৩	মোহাম্মদ আইদিত ইবনে মঞ্জু	লালখান বাজার	০১৯৮৮৩০৪৯২৯
৩৪	মোহাম্মদ ইমরান হাসান	লালখান বাজার	০১৭১২১৪১৩২৩
৩৫	মোহাম্মদ তাহসিন আল ইসলাম	লালখান বাজার	০১৬৮০১২৮৯৪৮
৩৬	মোহাম্মদ ওবাইদুল হক	লালখান বাজার	০১৮১২২০৮৫২০
৩৭	মোহাম্মদ সেলিম উদ্দীন	লালখান বাজার	০১৮৫৪১১০৯২৬
৩৮	সানজিদা আক্তার চৌধুরী	লালখান বাজার	০১৮২৪৮৩৫৬২৬
৩৯	মোহাম্মদ খোরশেদ আলম	লালখান বাজার	০১৭১২২৫৩১২২
৪০	মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন হাসান	লালখান বাজার	০১৭৩১৫৫২৬১৬
৪১	মোহাম্মদ আবু কাউছার	মতিঝর্ণা আবাসিক এলাকা	০১৮১২৪৫০১১৯
৪২	মোহাম্মদ আলী আজাদ	পূর্ব নাছিরাবাদ	০১৮১৭৭১৩৩৮০
৪৩	মোহাম্মদ জাকির হোসেন	লালখান বাজার	০১৮২০৫৬৩২৮১
৪৪	মোহাম্মদ সুমন	লালখান বাজার	০১৬৭৬২১৯০১৭
৪৫	মাহবুব খান	দামপাড়া	০১৮২০৯৯৩৮৩২
৪৬	মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ নাছির	লালখান বাজার	০১৮১৫৪৭৭৯৩৫
৪৭	মোহাম্মদ আহসান হাবিব চৌধুরী তাইসির	দামপাড়া	০১৬৮৯৩২৩৯০১
৪৮	মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন (কামাল)	দামপাড়া	০১৮১২৬১৫৮৫৬
৪৯	মোহাম্মদ সাজ্জাদ মাহমুদ	দামপাড়া	০১৬৭১৪৭৬৮০১
৫০	এ.বি.এম মনজুরুল আলম		০১৮১৯১৭১৩১৪
৫১	মোহাম্মদ শাহপরাণ	কোতোয়ালী	০১৮৪৫০৮৪১৭৬
৫২	মোহাম্মদ ইসমাইল		০১৮৩২২২৩৭৮৪
৫৩	মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ	হাইলেভেল রোড়	০১৬৮২৮১৭৯২১
৫৪	মোহাম্মদ আকরাম খান	দামপাড়া	০১৬৭৩২১৭২০৮
৫৫	মোহাম্মদ আসিফ হাসনাইন		০১৮১২৮৬৫৩২১
৫৬	মোহাম্মদ রুবেল		০১৮২৫৬৬১৫২৫
৫৭	মাহমুদ ফয়সাল		০১৮৩৯৫৭৭৪৭৫

সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং

ক্রম	নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
৫৮	মোহাম্মদ আনিসুর রহমান		০১৮১৮৫৭১৪২০
৫৯	মোহাম্মদ বেলাল		০১৮১৮৪৭৮২৯৯
৬০	মোহাম্মদ ইউসুফ মিয়া		০১৮১৯৮৮৯৬২২
৬১	এ্যাড. মুহাম্মদ রাশেদ ফারুকী	নোয়াখালী	০১৭১২২৩৩৭৪১
৬২	মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন		০১৯৩৬২৩৪৭৩৭
৬৩	মোহাম্মদ মহিউদ্দীন		০১৮১১৫৯১৯৭৪
৬৪	মোহাম্মদ তাউফুর রহমান	বায়েজীদ	০১৯৮৯১২২৬১৬
৬৫	মোহাম্মদ শাহ-জাহান	চকবাজার	০১৮১২৭২৪০৫৮
৬৬	মোহাম্মদ শাহ-পরাণ		০১৮২৪৮৮৭৩৬০
৬৭	মোহাম্মদ আজাদ		০১৬৭৬৪২৮০৪২
৬৮	মোহাম্মদ জসিম		০১৭১২৭৬৫৪৫৫
৬৯	মোহাম্মদ জাহেদুল হাসান রুবায়েত	হাই লেভেল রোড়	০১৮১৫৮৫৮১৫৩
৭০	মোহাম্মদ আবদুল বারী	এম.এম.আলী রোড়	০১৭১৬৪৮৮৮১৩
৭১	মাওলানা মোহাম্মদ সেলিম উদ্দীন	জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ	
৭২	মোহাম্মদ আরমানুল হক শিবলু	হাই লেভেল রোড়	
৭৩	মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	হাই লেভেল রোড়	০১৮৫৮৮১৭৪৪৪
৭৪	আলহাজ্ব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম	কে.বি. ফজলুল কাদের রোড়	০১৮১৯৩১১৫০৮
৭৫	মোহাম্মদ আদনান তাহসিন	জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া	০১৮২২৬০১১৯৩
৭৬	মোহাম্মদ আসবার তানজিম	জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া	০১৮২৫৩৩৩১৯১
৭৭	মোহাম্মদ ইমরান হোসাইন	আনোয়ারা	০১৮২২৩১৩৬১৬
৭৮	মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল	ব্যাটারী গল্লি	০১৮১৯৮৮৩২৯৩
৭৯	মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	এস.এম খালেদ রোড	০১৮১৯৮৪৬৪৬৯
৮০	সৈয়দ মোহাম্মদ জাহিদ ক্বাদেরী	রাউজান	০১৮১৪৯৫৪০২৪
৮১	মোহাম্মদ সাইদুর রহমান রাজু	লালখান বাজার	০১৮৪০০২৫৩১২
৮২	আলহাজ্ব মোহাম্মদ জাকির হোসেন চৌধুরী	লালখান বাজার	
৮৩	সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুস সোবহান	লালখান বাজার	
৮৪	মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম	মতিঝর্ণা আবাসিক এলাকা	
৮৫	মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন	দামপাড়া	০১৮২৩৭৯০৪৯৭
৮৬	হাফেজ মোহাম্মদ আহমদ রেজা	জমিয়তুল ফালাহ মসজিদ	

এ্যালবাম

একাডেমির উদ্যোগে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করছেন আগত অতিথিবৃন্দ।

'পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালায় আহলে হাদীসের ভ্রান্ত মতবাদের জবাব' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনকালে অতিথিবৃন্দ।

ইফতার সামগ্রী বিতরণ এবং গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আল্লামা জালাল উদ্দীন আলকাদেরী।